উৎস মানুষ

৪২বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
পুরনো সংখ্যা থেকে		২
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	শোভনলাল দত্তগুপ্ত	৪
অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে	আশীষ লাহিড়ী	৬
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সমীরকুমার ঘোষ	৮
সবুজ বিপ্লব	সুশান্ত মজুমদার	১২
কোভিড-এর পরে	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১৬
স্বচিকিৎসা (৮)	গৌতম মিস্ত্রী	১৯
জলদিদি	প্রকাশ দাস বিশ্বাস	২২
জল জলাশয়	অরিত্রী দে	২৫
আদিবাসী সমাজ	সঙ্গীতা মুখার্জি	২৮
বিপন্ন বালিকাবেলা	মৈত্রী পণ্ডিত	৩১
বৈবাহিক ধর্ষণ	রাখী চৌধুরী	৩৫
প্রতিবেদন		৩৮

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল : utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক : http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

বছর শেষ হতে চলল। আশা করা যায় আমরা কোভিড অতিমারীর অন্তিম পর্বে পৌঁছেছি। এ বছরেও আমরা অনেক গুণীজনকে হারিয়েছি। গত ২ অক্টোবর, ২০২২ উৎস মানুষের অভিভাবকসম শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রয়াত হন। উনি বরাবরই অমূল্য সব লেখা দিয়ে উৎস মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে। ওঁর লেখা বই *নিজের মুখোমুখি* উৎস মানুষ প্রকাশনার একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। বলাই বাহুল্য তাঁর লেখা লিটল ম্যাগাজিন-এর আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের প্রয়াণে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। এই সংখ্যায় ওঁর সহপাঠী শোভনলাল দত্তগুপ্ত প্রয়াত বন্ধুর স্মৃতিচারণ করেছেন। সেই সঙ্গে থাকছে *নিজের মুখোমুখি* থেকে প্রশ্নোত্তরে অংশ 'মনের জানালা খুলে', যেখানে পার্টি ছাড়াও চিন্তায় চেতনায় আত্মস্মরণ হতে বলেছেন।

ওআরএস কথাটা কারো অজানা নয়। কিন্তু এই জীবনদায়ী পানীয় প্রথম সফল প্রয়োগের পেছনে ডাক্তার দিলীপ মহলানবীশ-এর অবদান নিয়ে তেমন কোনও প্রচার নেই। লাখ লাখ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ওআরওস-এর কোনও বিকল্প নেই। সম্প্রতি প্রয়াত হলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী দিলীপ মহলানবীশ (১৯৩৪-২০২২)। একটি সাক্ষাৎকারে (উৎস মানুষ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত) তিনি কলেরা ও ডায়ারিয়া আক্রান্ত রোগীদের ওপর ওআরএস প্রয়োগ নিয়ে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা বলেন।

খবরে প্রকাশ রেলের জমিতে অবৈধভাবে হনুমানজির মন্দির নির্মাণ করায় স্বয়ং হনুমানজিকে উচ্ছেদের নোটিস পাঠানো হয়! যার দায়ে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ধানবাদ ডিভিশন থেকে বদলি করে দেওয়া হল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ডিভিশনে (পূর্বতন মোঘলসরাইতে)। উৎসাহিত হল ধর্ম ব্যবসায়ীরা। কয়েকদিন ধরে ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে একটি 'খোলাচিঠি' আলোড়ন তুলেছে। রোগশয্যা থেকে পাঠানো মমস্পর্শী সেই প্রতিবাদ পত্রটি পোস্ট করেছেন দিল্লী নিবাসী এক প্রবীণা অধ্যাপক। এ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির প্রতিকার চেয়ে ও চাকরির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত যুবক ও যুবতীদের ওপর সাম্প্রতিক পুলিশি অত্যাচার নিয়ে লেখা প্রতিবাদ পত্রটি বহু মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে। প্রতিবাদী অধ্যাপকের স্বপ্ন আন্দোলনকারীদের যথার্থ স্থান হোক ক্লাসরুমে, ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে। সম্মুখে থাকুক একদল তাজা কচি শালতরু, মাথা

উঁচু করে। তিনি শিক্ষক ও চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষকদের প্রতি যে অপমান ও বঞ্চনা চলছে, অবিলম্বে তার অবসান চেয়েছেন। আমরাও তাই চাই।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ সংখ্যায় নারায়ণচন্দ্র রাণাকে নিয়ে লেখাটিতে কিছু তথ্যগত ভুল ছিল। সেগুলি সংশোধন করা হল।

নারায়ণচন্দ্র রাণা ছিলেন ১৯৭৫ সালের এমএসসির ছাত্র। তবে সেই ব্যাচ এমএসসি পাশ করে ১৯৭৭ সালে। পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে নারায়ণচন্দ্র রাণা যখন ছাত্র ছিলেন তখন কবি বিষ্ণু দে নয়— কবির পুত্র অধ্যাপক জিষ্ণু দে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। সম্ভবত তাঁর মাধ্যমে নারায়ণ চন্দ্র রাণা কবির সংস্পর্শে এসেছিলেন। রাণা বিদেশে কমনওয়েলথ বার্সারি পুরস্কার পান। সার্ক (SAARC) ফেলোশিপও পেয়েছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে নারায়ণচন্দ্র রাণা প্রথমে টিআইএফআর-এ 'ফেলো' হিসেবে যোগদান করেন। পরে রিডার পদে উন্নীত হন। ১৯৯১ সালে তিনি পুনের আইইউসিএএ (IUCAA)-তে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৯৬ সালে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (অ্যাস্ট্রোনমি ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্সি) পদে উন্নীত হন।

১৯ নভেম্বর ২০২২ (শনিবার) কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি সভাঘরে বিকেল ৫টায় দ্বাদশ অশোক বন্দোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। এবারের বক্তা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই।

পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা জানুয়ারি ২০২৩-এ প্রকাশিত হবে।

— পরিচালকমণ্ডলী উমা

মানুষ (উৎস মানুষ) পত্রিকার পুরনো সংখ্যা থেকে (৩)

কেমন ছিল সংখ্যাগুলি? তারই কিছু নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস মূলত নতুন পাঠকদের কথা ভেবে। প্রথম বছরে (১৯৮০) প্রতিমাসে একটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হত, প্রথম পর্বে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ও বিনিময় মূল্য থাকত যথাক্রমে ১৮ এবং ০.৭৫ টাকা। প্রথম বছরে পত্রিকা 'মানুষ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পত্রিকা 'উৎস মানুষ' নামকরণ করা হয়। পাঠকদের অনুরোধে সেপ্টেম্বর (১৯৮০) মাস থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ করা হয় এবং পত্রিকার বিনিময় মূল্য ধার্য করা হয় এক টাকা। বাৎসরিক ১২ টাকা।

মানুষ প্রথম বর্ষ মে সংখ্যা, ১৯৮০ ঃ এই সংখ্যায় বিজ্ঞান ইতিহাসের লেখক সমরেন্দ্রনাথ সেন — ***মহাবিশ্বের জন্মকথা*** — শিরোনামে প্রবন্ধের মুখবন্ধে লিখেছিলেন — "...এইরকমই বিচিত্র সব রূপকল্পনা ছিল প্রাচীন চিন্তায় বিশ্বজগৎ নিয়ে। গ্রীকরা বিশ্বাস করত পৃথিবী ভাসছে অন্তহীন সমুদ্রে একটা চ্যাপ্টা থালার মত। ব্যাবিলনীয়রাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করত। তারপর ক্রমে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের পর সপ্তদশ শতাব্দীর নিউটন, অষ্টাদশের দার্শনিক কান্ট, গণিতজ্ঞ লাপ্লাস— এদের মনীষায় মহাবিশ্বের রহস্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। এরপরও যে স্মিথ ভাইজেকার, টার হার, কুপার, ইউকেনের মত বিজ্ঞানীরা সৌরমণ্ডলের উদ্ভব নিয়ে নানা তত্ত্ব, আলোচনা, বিতর্ক এনেছেন। জোন্স, মুলটনের বহিঃশক্তিতত্ত্ব, গ্রহাণুপুঞ্জতত্ত্ব বা জিনসের অন্য নক্ষত্রের সূর্য থেকে খুবলে নেওয়ার তত্ত্ব বাতিল হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যকে ক্রমশঃ পূর্ণ প্রকাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে নানা মতবাদের মধ্যে দিয়ে।" রচনাটি মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সংক্ষেপে বুঝতে সাহায্য করে।

এই সংখ্যায় সৌমিত্র শ্রীমানী দুই পর্বে (মে-জুন) ***বাংলাদেশে জাতিভেদ*** কেন ও কিভাবে তার ক্রমবিকাশ এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারাবাহিক লেখা প্রমিথিউসের পথে-র লেখক অমিত সান্যাল **লুইগি গ্যালভানি** সম্পর্কে লিখেছেন। রয়েছে 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তী' সিরিজ এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ।

মানুষ প্রথম বর্ষ জুন সংখ্যা, ১৯৮০ ঃ এই সংখ্যায় অমিয়কুমার হাটি লিখেছেন ***সর্প দংশনের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা*** — যা এখনও প্রাসঙ্গিক। অন্যান্য লেখা ***মৎস্য কন্যার রহস্য*** এবং প্রমিথিউসের পথে সিরিজে ***চার্লস ডারউইন***। জুলাই ১৯৮০ সংখ্যায় অর্চনা শর্মা এবং আরতি রায়চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক রচনা ***জাতিভেদ ও বংশানুতত্ত্ব*** খুবই প্রাসঙ্গিক বর্তমান সময়েও। *প্রমিথিউসের পথে* সিরিজে অনুপম দত্ত লিখেছেন সত্যনিষ্ঠ,

জ্ঞানী ও সমাজসংস্কারক *প্যারাসেলসাস* সম্পর্কে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য-র নিবন্ধ ধূমকেতু সংস্কারে ও বিজ্ঞানে ও ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতুর প্রত্যাবর্তন নিয়ে সুন্দর উপস্থাপনা পাঠককে উদ্দীপ্ত করে।

প্রথম বর্ষ ১৯৮০ অগাস্ট সংখ্যার সূচিপত্র — লোকসংস্কৃতি ও ভদ্রলোক সংস্কৃতি; জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ; বর্ষায় ফুলের বর্ণ গন্ধ; উৎসপুরুষ সিরিজ শুরু হয় এই সংখ্যা থেকে। মুখবন্ধে লেখা হয়েছিল ''যোহান গ্রেগের মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) এক অবহেলিত প্রতিভা যাঁকে স্কুলপাঠ্যে জীববিজ্ঞানের বই-এর পাতায় মটরসুঁটির পরীক্ষাটুকুতে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। আজ তিনি বংশাণুবিদ্যার জনক আখ্যায় ভূষিত। ....সেই সংগ্রামী মানুষটির মর্মকথা এক যুগজীবনের পটভূমিতে উন্মোচিত - এই **উৎসপুরুষ** উপন্যাসে, যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে মানুষে-র পাতায়।''

প্রথম বর্ষ সেপ্টেম্বর (১৯৮০) সংখ্যায় অভিজিৎ লাহিড়ী লিখেছেন রোহিনী বিজয়ের অন্তরালে— যেখানে লেখক রোহিনী উপগ্রহের সাফল্য নিয়ে ভবিষ্যৎ সামরিকিকরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— ...''অচিরে যদি অভুক্ত, জরাজীর্ণ, মুমূর্ষু ভারত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র হাতে এশিয়ার রণাঙ্গণে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের নাচ নাচতে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।'' ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন মানস-প্রতিবন্ধী ও সমস্যা সম্পর্কে আরও অন্যান্য লেখা — 'শিশু ও তার পরিবেশ', 'জোসেফ প্রিসলী', 'পুজো পায় তিমি মাছ' এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল, তৎসহ ধারাবাহিক উপন্যাস 'উৎসপুরুষ'।

উমা

প্রয়াত ডাক্তার দ্বিজদাস ব্যানার্জী

(১৯৪৪-২০২২)

একাধারে সুচিকিৎসক ও নীতি-আদর্শ নিয়ে চলা মানুষ যেন সমাজ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। ডাক্তার দ্বিজদাস ব্যানার্জীর প্রয়াণে আমরা তেমনি একজনকে হারালাম। গত ২৪ অগাস্ট কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে মাসখানেক ধরে লড়াই করে শেষ রক্ষা আর হল না। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রাইভেট প্র্যাক্টিসের হাতছানি উপেক্ষা করেন। তবে দু-একটি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগী দেখতে যেতেন। কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। বাড়িতে বলে রেখেছিলেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে। ওঁর ধারণা (আরো অনেকেরই) ছিল কর্পোরেট হাসপাতালের খপ্পরে পড়লে পরিবার ধনেপ্রাণে মারা যাবে। যতদিন সুস্থ ছিলেন উৎস মানুষ পত্রিকা আয়োজিত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতায় এসেছেন। নিজের ছোটভাই অশোক আমৃত্যু যে পত্রিকাকে লালন-পালন করে গেছে তার প্রতি আলাদা টান ছিল। উৎস মানুষ যে এত বছর ধরে চলেছে তা দ্বিজদাস ব্যানার্জীর কাছে খুব বড় ব্যাপার ছিল। ওঁর প্রয়াণে উৎস মানুষ একান্ত আপনজনকে হারাল। প্রয়াত দ্বিজদাস ব্যানার্জীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা
(১৯৪৭-২০২২)

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে ১৯৬৬-৬৮ পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওঁর বিষয় ছিল ইংরেজি, আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সেটা ছিল উত্তপ্ত, অশান্ত রাজনৈতিক সময়। আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সি পি আই-এর ছাত্র সংগঠনের বি পি এস এফ (বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন) সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। যতদূর মনে পড়ে, তপনের মাধ্যমেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল। রামকৃষ্ণ ছিলেন বি পি এস এফ-এর নেতৃস্থানীয় পদে আসীন একনিষ্ঠ কর্মী। আমরা অনেকেই এইভাবে বি পি এস এফ-এর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলাম এবং আমাদের সকলের নেতা ছিলেন প্রয়াত কমলেন্দু গাঙ্গুলি।

এই যে সময়টার কথা বলছি, তখন একদিকে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটেছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভাজন ঘটে গেছে ১৯৬৪ সালে, ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাতের অন্ধকারে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের অপসারণ মানুষকে প্রবলভাবে বিচলিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে গোটা দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা আমাদের তরুণ মনকে সেদিন প্রবলভাবে উদ্বেলিত করেছিল, যদিও চীন-সোভিয়েত বিরোধ আমাদের অনেকের কাছেই মনঃপূত ছিল না। রামকৃষ্ণের মতো তপন, আমি এবং আমাদের বন্ধুদের এক বড় অংশ ছিলেন সোভিয়েতের পক্ষে। এখনও মনে পড়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ সোচ্চারে স্লোগান দিচ্ছে— হো চি মেন, কোসিগিন, লাল সেলাম, লাল সেলাম।

ছাত্রজীবনে ইতি টানার পরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার আর তেমন যোগাযোগ ছিল না। আমরা যে যার কর্মক্ষেত্রে যোগ দিই, খবর পাই যে রামকৃষ্ণ কলকাতার আনন্দমোহন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত। অনেক দিন পর, ও যখন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বই লিখতে শুরু করে, তখন ও কয়েকটি তথ্য যাচাই করার জন্য একদিন আমাকে ফোন করে। সেই সময় থেকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে ও আমাকে ওর লেখাপত্র পাঠাতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে ওর দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দেয় এবং এক ধরনের শারীরিক অসুস্থতা ওকে গ্রাস করতে শুরু করে। এখন ভাবতে ভাল লাগে যে, এই সময়ে রামকৃষ্ণকে দিয়ে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা সংগঠিত করতে সফল হয়েছিলাম। ভারতবিদ্যাতে আমার কোনও ব্যুৎপত্তি নেই, কিন্তু মার্কস ও মার্কসবাদ প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে মাঝেমাঝে আলোচনা হত। ওর অনেক অবস্থানের সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না, কিন্তু আমার যেটা ভাল লাগত তা হল যে, নিজের মতো জার্মান ভাষা কিছুটা আয়ত্ত করে ও মার্কসের মূল লেখাপত্র পাঠে প্রয়াসী ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা, রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, যা আজকের দিনে বড়ই দুর্লভ। ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশ করে নিজের আখের গুছিয়ে নেবার যে প্রবণতা আজ অনেক বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দেখি, রামকৃষ্ণের মধ্যে তার লেশমাত্রও ছিল না।

তপন, রামকৃষ্ণ কেউই আজ আর নেই। পরিচিতির বৃত্তটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, এটা ভাবতে গিয়ে মন এক এক সময়ে খুব ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

উমা

*উৎস মানুষ সংকলন **নিজের মুখোমুখি** বইটির প্রথম সংস্করণের (২০০৫) ভূমিকায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন —"অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছে দুজনের মধ্যে। একজনের বয়স পঁচিশ-তিরিশ। নাম ধরা যাক, প্রশ্নময় ইতস্তত। ছোট করে বলা হবে : **প্র:** দ্বিতীয় জনের বয়স পঞ্চাশের ধারেকাছে। নাম অভিজ্ঞ উত্তরীয়, ছোট করে **উ:** ।'' প্রশ্নোত্তরে ছোট্ট এই বইটি রামকৃষ্ণ ভট্টচার্যের চিন্তা ও মননের ধারাভাষ্য বলে ধরা যেতে পারে। প্রাচীন ও নবীনের যোগসূত্রে তাঁর নিরলস সাধনা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জারি ছিল। উৎস মানুষ পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন এবং অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সখ্যতা। তাঁরা দুজনেই আজ বাস্তবের পরপারে। তাঁর প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ কিছু সংযোজন সহ প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। বইটির প্রথম প্রশ্নোত্তর অংশটি 'মনের জানালা খুলে' এখানে তুলে ধরা হল।*

মনের জানলা খুলে

প্র : পার্টি বা ঐ ধরণের কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে যোগ না-দিলেও একটা বয়েসে আমরা ভিড়ে যাই নানা ধরণের কাজেকম্মে — পাড়ার ক্লাব, গণবিজ্ঞান সংস্থা, গ্রুপ থিয়েটর বা অন্য কিছু। কেউ কোনোমতে মাধ্যমিকের বেড়াটা ডিঙোই, কেউ বা কলেজে ঢুকে উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েশনটুকু কোনোক্রমে চুকোই। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য শিক্ষায় কোনো উৎসাহও পাই না। বরং অন্য কাজেকম্মে মনপ্রাণ ঢেলে দিই। কুড়ি-একুশ বছর বয়েসে লেখাপড়ার পাট চুকে যায়। বাড়ির লোকের কথা শুনি না, বিদ্রোহের ভাব ও ঝাঁঝটা খুব বেশি থাকে। 'নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেব' বলে গোঁয়ারের মতো গরম দেখাই। হাতখরচা চালানোর জন্যে বড়জোর টিউশন সম্বল। সেও খুব অনিশ্চিত। অনেকের তাও জোটে না বা কিছুই করে না। আমাদের সংগঠনগুলোও চলে আমাদেরই পয়সায়। দু-চার বছর এইভাবে চলে যায়। তারপর বাড়িতেও সমস্যা দেখা দেয়। উচ্চ-গরিব বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা কতদিন এভাবে টানতে পারে? তারপর ধরুন, কেউ যদি বিয়ে করে ফেলে, তাহলে তো অবস্থা সঙ্গীন। আমাদের সংগঠনগুলো কোনোদিন আমাদের হাতখরচাও জোগাতে পারে না। এ অবস্থায় কিংকর্তব্য?

এই ভাবতে ভাবতে দিন কেটে যায়। চাকরিবাকরি করার ব্যাপারে গোড়া থেকেই মনে মনে একটা ভীষণ আপত্তি থাকে — মনে হয়, এ তো কেরিয়ার করা হয়ে যাবে। বয়েসও ইতিমধ্যে বেড়ে যায়। দমও থাকে না, উদ্যমও থাকে না। তখন আরও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। এ ব্যাপারে কী করা যায়?

উ: একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে নেওয়া উচিত। যদি কোনো পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী না হও বা ট্রেড ইউনিয়ন না করো — যেখানে ওয়েজ পাওয়া যাবে, তাহলে নিজের চলার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো সংগঠনের ওপর ভরসা করে কোনো লাভ নেই। বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে যখন কারুর নেই, নিজের চলার মতো একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে নেওয়া উচিত। বিশেষ করে বিয়ে করলে তো কোনো বিকল্পই থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঘটে এর উল্‌টো। বিয়ে করার পর পাছে কেউ ভাবে সে আর কোনো কম্মে লাগবে না, সে তখন কোনো রোজগারের চেষ্টা না করে আরও বেশি করে কাজে লেগে যায়। দিনে ষোলো ঘণ্টা খেটে প্রমাণ করার চেষ্টা করেঞ্জ আমি যেমন ছিলুম, তেমনি আছি। এই করে অবস্থা আরও খারাপ হয়। অন্তত নিজের বাঁচার ব্যবস্থা নিজে না করে নিলে কোনো কাজকম্মই করতে পারবে না। যার জন্যে লেখাপড়া ডকে তুলে, কেরিয়ার না-করে এসব করতে যাওয়া — সেটাও ডোবে, কায়ক্লেশে বাঁচাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার থেকে আসে হতাশা, গভীর অবসাদ, এমনকি মানসিক বিপর্যয়।

কেরিয়ার কথাটা নিয়েও একটা বিচিত্র ভুল ধারণা থাকে। যে-শ্রমিক বিড়লার কারখানায় কাজ করেন — মজুরি পান, বোনাস পান — তিনি তো প্রাণধারণের জন্যেই তা করছেন। তাঁর মজুরির পয়সাতেই তো ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বা পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী তাঁর ওয়েজ পাচ্ছেন। নিজের বাঁচার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। এতে কোনো গ্লানিও নেই, অন্যায়ও নেই।

আসলে পার্টিতে না-থেকেও তোমাদের মনে কেমন একটা পার্টি-পার্টি ভাব থাকে। যিনি গল্প লেখেন,

নাটক করেন — তিনি ভাবেন, তেমন একটা পার্টি যদি থাকত, আমার নিত্যকার তেল-নুন-লকড়ির খরচাটা যদি সে দিত, তাহলে আমি নিশ্চিন্তে লেখালিখির কাজ করতে পারতুম। কিন্তু তেমন কোনো পার্টি বা মজবুত সংগঠন তো তোমার নেই! তাহলে বৃথা চিন্তা কর কেন? বরং ভাবনাটা এই রকম হওয়া উচিত : আমার নিজের বা পরিবারের জীবনধারণের জন্যে আমি কারুর মুখাপেক্ষী হব না। আমার নিজের আয়ের পয়সায় বরং আমার পছন্দমতো কাজ করব। কিন্তু কখনোই শুধু স্বার্থচিন্তায় ডুবে যাব না। জীবনযাত্রার মান ক্রমশই বাড়িয়ে চলার চেষ্টা করব না। ভোগবাদের ফাঁদে পা দোব না। পার্টি ছাড়াও আমি যেমন চিন্তায় চেতনায় আত্মশরণ হতে পারি, জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর বেলায়ও আমায় তেমনিই আত্মশরণ হতে হবে। দু-এর ক্ষেত্রেই একই কথা : কোনো বিকল্প নেই। উমা

অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মেন্ডেলিয়েভের জেহাদ

আশীষ লাহিড়ী

গানবাজনা শিখতে গেলে যেমন স্বরলিপি শিখতে হয়, তেমনি রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা শিখতে গেলেও পর্যায়সারণি (পিরিয়ডিক টেব্‌ল) শিখতে হয়। সেই স্বরলিপি উদ্ভাবন করে দ্‌মিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিয়েভ (১৮৩৪-১৯০৭) বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত খ্যাতি, এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও রাশিয়ার একশ্রেণির মানুষের, এমনকী বিজ্ঞানীর কাছে, তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। তার প্রমাণ, ১৮৮১ সালে, যখন তাঁর খ্যাতি জগৎজোড়া, তখন রুশ ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর নির্বাচনে ১ ভোটে তিনি হেরে যান। এই হারকে উপলক্ষ করে বিজ্ঞানে উপজাতিক রুশদের ভূমিকা নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়। এর পর এসব থেকে সরে এসে মেন্ডেলিয়েভ নিজের সারস্বত কর্তব্য পালনেই মন দেন। কিন্তু তাতেও সমস্যা বাধে। ১৮৯০-তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অধিকার সংক্রান্ত একটি আবেদনপত্র নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়। পরিণামে মেন্ডেলিয়েভ পদত্যাগ করেন। যোগ দেন নৌবহরের গবেষণা বিভাগে। এক বিশেষ ধরনের নির্ধূম বারুদের উদ্ভাবন করেন। ১৯০৭-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

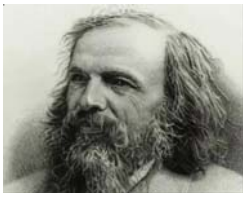

অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে জেহাদ

১৮৮১ সালে রাশিয়ান ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর নির্বাচনে তাঁর হারের সময়েই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম, কুসংস্কার আর অপবিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে তুমুল এক বিতর্ক দানা বাঁধে; সে-বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন মেন্ডেলিয়েভ।

জার নিকোলাস-১ (১৭৯৬-১৮৮৫৫) সংখ্যালঘু ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ঘোষণা করবার পর রাশিয়াতে প্রেতচর্চার ও নানারকম গুহ্য বিকৃত ধর্মচর্চার ধুম পড়ে গিয়েছিল। জার-পোষিত সংখ্যাগুরু অর্থোডক্স চার্চ তাতে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। তাদের ধর্মমত অনুযায়ী এসব হচ্ছে শয়তানের, ডেভিলের, কারবার, এসব বন্ধ হওয়া উচিত। অন্যদিকে চার্চের ভেতরেরই এক অংশের এগুলোর প্রতি দুর্বলতা ছিল। তার ওপর বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে এই প্রেতচর্চা হু হু করে প্রভাব বিস্তার করেছিল, কোনো কোনো অভিজাত মহলেও, যাদের ''সালঁ''য় ভূত নামানোর নিয়মিত আখড়া বসত। এই প্রেত-তরঙ্গ রোধ করার সাধ্য অর্থোডক্স চার্চের ছিল না, ইচ্ছেও কতটা ছিল সন্দেহ। এ অব্দিও একরকম ছিল; কিন্তু যখন কিছু বিজ্ঞানীও এই প্রেতচর্চার পক্ষে প্রচার আরম্ভ করলেন তখন অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে উঠল। অপরদিকে যারা এসবের ঘোর বিরোধী সেই যুক্তিবাদীরা আবার ধর্ম ব্যাপারটার প্রতিই অনীহ; কাজেই যত যাই হোক, তাদের সাহায্য তো আর নেওয়া যায় না, বিশেষ করে যেহেতু তাদের অনেকেই আবার রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বড়ো ফাঁপরে পড়ে গেল রাষ্ট্র আর অর্থোডক্স চার্চ।

উনিশ শতকে প্রেতচর্চার এই হুজুগের উৎপত্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-য়। সেখান থেকে তা পশ্চিম ইউরোপে ছড়ায়। ক্রুক্স টিউবের আবিষ্কর্তা উইলিয়াম ক্রুক্স (১৮৩২-১৯১৯) যে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে খবর তো আমাদের জানা। এ নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনা আমরা পড়েছি। ১৮৫০-এর দশকে রাশিয়াতে প্রেত-হুজুগের সূচনা হয় ড্যানিয়েল ডানগ্লাস হিউম নামক জনৈক স্কটিশ প্রেততত্ত্ববিদ মারফত। ১৮৭০-এর দশকে নামকরা

রসায়নবিদ আলেকজান্ডার বাটলারভ আর প্রাণিবিজ্ঞানী নিকোলাই ভাগনার-এর সমর্থনে এবং আক্সাকভ নামক এক আধা-বিজ্ঞানীর প্রযত্নে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এঁরা প্রেতচর্চাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করতে থাকেন, এমনকী তার নানারকম ''প্রমাণ''ও দাখিল করতে শুরু করেন। ২০২২-এর ভারতে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা কল্পনা করে নিতে আমাদের এতটুকু অসুবিধে হয় না।

বাটলারভ আর ভাগনার দুজনেই ছিলেন রাশিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত সেন্ট পিটার্সবার্গ অ্যাকাডেমিতে মেন্ডেলিয়েভের সহকর্মী। বন্ধু বিজ্ঞানীদের এই অধঃপতন এবং জনসমাজে তার পরিণাম দেখে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন মেন্ডেলিয়েভ। অনেক তর্কবিতর্ক, অনেক বক্তৃতা দিয়েও যখন ফল হল না, তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন, প্রেতচর্চা বুজরুকি না বিজ্ঞান, তার পাকাপাকি ফয়সালার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হোক। মেন্ডেলিয়েভের তখন জগতজোড়া প্রতিষ্ঠা। সুতরাং তাঁর প্রস্তাবে লন্ডনের ফিজিক্যাল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে গঠিত হল এই 'মেন্ডেলিয়েভ কমিশন'। ঠিক হল, একটা নির্দিষ্ট সময়পর্বের মধ্যে নিখাদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চল্লিশটি ভূত-নামানোর অধিবেশন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে রায় দেবে কমিশন। প্রকৃত অনুসন্ধান করলে এই বুজরুকির মুখোশ যে খুলে যাবে মেন্ডেলিয়েভের তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। ও পক্ষও প্রস্তুত। তাঁরা সারা ইউরোপ ঢুঁড়ে আগমার্কা ''মিডিয়াম''দের থাকা-খাওয়ার খরচ দিয়ে সেন্ট পিটার্স বার্গ নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিলেন। নিউ ইয়র্কের প্রেত-বিশেষজ্ঞরা যোগ্যতম প্রার্থীদের তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আক্সাকভ জাহাজে করে ব্রিটেন চললেন ইউরোপীয় আবেদনকারীদের যোগ্যতা পরীক্ষা করবার জন্য।

ব্রিটেন থেকে জোসেফ আর উইলিয়াম পেটি নামক দুই ভাইকে রাশিয়া নিয়ে আসা হল তাঁদের ভর হওয়ার প্রক্রিয়া দেখানোর জন্য। তাঁরা নাকি ভূত নামানোয় ওস্তাদ। প্রথম পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে গেল, দুই ভাই পাক্কা জোচ্চোর। দেশ জুড়ে হৈহৈ পড়ে গেল। কিন্তু আক্সাকভ অম্লানবদনে বললেন, মিডিয়াম হিসেবে এঁরা নেহাতই 'দুর্বল' বলেই কাণ্ডটা ঘটেছে। জোচ্চুরিকে দুর্বলতা বলে চালাবার চেষ্টা করলেন তিনি। ভাবখানা হচ্ছে, সত্যিকারের ভালো মিডিয়াম হলে এসব দুনম্বরি ছাড়াই প্রমাণ করা যাবে যে প্রেতচর্চা একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। এবার তাঁরা অকুতোভয়ে মেরি মার্শাল নামে আর এক 'সবলা' মহিলা-মিডিয়ামকে পেশ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এঁর বায়োডেটা খুবই জোরালো। ইনিই স্বয়ং সার উইলিয়াম ক্রুকসকে ভূতে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলেন। টেবিল-ঠকঠকানি, টেবিলের শূন্যোত্থান, রুমালে গিঁট পড়া, কাচের ওপর লেখা ফুটে ওঠা, ইত্যাকার নানাবিধ প্রেত-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখানোয় তিনি নাকি সিদ্ধহস্ত। আক্সাকভ এবং তাঁর দলবল নিশ্চিত, এবার মেন্ডেলিয়েভ কম্পানির পরাজয় নিশ্চিত।

কিন্তু এইসব ব্যস্ত বিদেশি মিডিয়ামদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাশিয়া নিয়ে আসতে এবং পরীক্ষকদের সামনে পেশ করতে প্রেতপন্থীদের অনেক দেরি হয়ে গেল। কথা ছিল নির্দিষ্ট পর্বে পর্বে ভাগ করে ১৮৭৬-এর মে মাসের মধ্যে কমিশনের সামনে চল্লিশটি প্রেত নামাতে হবে; সে-কর্মসূচি ঠিকঠাক পালন করা গেল না। অনিয়ম দেখে কমিশন বেঁকে বসল। মার্চ মাসে কমিশন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল। প্রেত-পন্থীরা নিজেদের সরিয়ে নিলেন। মেন্ডেলিয়েভ-এরও দোষ ছিল। তদন্ত যখন চলছে সেই সময়ই উত্তেজিত হয়ে তিনি ১৮৭৫-এর ১৫ ডিসেম্বর এক প্রকাশ্য সভায় প্রেতচর্চাকে সরাসরি জোচ্চুরি বলে রায় দিয়ে বক্তৃতা দিলেন। কমিশনের দৃষ্টিতে এটাও একদেশদর্শিতা। এরকম কাণ্ড তিনি বেশ কয়েকবার করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত কমিশন ভেস্তে গেল। শুরু হল প্রকাশ্য বাদানুবাদ। একের পর এক প্রকাশ্য বক্তৃতার আয়োজন করে মেন্ডেলিয়েভ প্রেতচর্চা নামক বুজরুকির মুখোশ খুলতে লাগলেন। লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে শুনতে আসত সেসব বক্তৃতা। সংগৃহীত টাকা তিনি ঘৃণাভরে বিলিয়ে দিতেন গরিব দুঃখীদের। খবরের কাগজেও একের পর লেখা বেরোতে লাগল তাঁর। অবশেষে নিজে একটা আস্ত বই লিখলেন — 'প্রেতচর্চা সম্পর্কে রায় দেওয়ার উপাদান'। ওপক্ষ থেকে চলল গালাগালির বন্যা। মেন্ডেলিয়েভকে তাঁরা কুচক্রী, বদমাশ, ঝগড়ুটে, বিভেদকামী প্রভৃতি বাছাই-করা বিশেষণে ভূষিত করলেন। আক্সাকভ এমনও বললেন যে মেন্ডেলিয়েভ আসলে মানসিক বিভ্রান্তি-রোগের শিকার; তিনি অমূল প্রত্যক্ষ করছেন (হ্যালুসিনেশন), যা ঠিক বলে মনে করছেন সেটাই যেন বাস্তবে ঘটেছে বলে কল্পনা করে নিচ্ছেন।

দুঃখের বিষয়, মেন্ডেলিয়েভের এত চেষ্টা সত্ত্বেও সেসময়কার রাশিয়াতে এই প্রেতচর্চার রমরমা আটকানো যায়নি। বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন এ নিয়ে উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। এ-ও তখনকার রাশিয়ার সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার আরেক উদাহরণ। পরে খোদ জারের ওপর

রাসপুতিন-এর তন্ত্রমন্ত্রের নিশ্ছিদ্র প্রভাবের কাহিনি তো আমাদের জানা। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় প্রেতচর্চার এই বাড়াবাড়ির জন্য অনেকে মেন্ডেলিয়েভকেই দোষ দেন। এঁদের বক্তব্য, তিনি যদি অত তেড়েফুঁড়ে এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ না-হতেন, তাহলে ব্যাপারটা এত বেশি প্রচার পেত না। নেতিবাচক প্রচার মানুষকে আরও কৌতূহলী করে তুলেছিল।[১]

আসলে বিজ্ঞানে নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী মেন্ডেলিয়েভ চোখের সামনে অপবিজ্ঞানের এই প্রসার দেখে, এবং তার পেছনে তাঁরই সহকর্মী বিজ্ঞানীদের মদত দেখে স্থির থাকতে পারেননি। বিজ্ঞান তো শুধু তাঁর জীবিকা ছিল না, ছিল জীবন। প্রতিবাদ করাটা তাঁর কাছে বিজ্ঞানীর স্বধর্ম। শুধু বিজ্ঞানী হিসেবে নয়, বিজ্ঞানমনস্কতার হয়ে এই আপোশহীন সংগ্রামের জন্যও তিনি অবিস্মরণীয়। এতবড়ো মাপের একজন বিজ্ঞানী ব্যক্তিগতভাবে অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে নামছেন এমন ঘটনার উদাহরণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

১। রাশিয়ায় প্রেতচর্চার বিস্তারিত জন্য দ্রষ্টব্য Julia Manneherz, Modern Occultism in Late Imperial Russia, Cornell University Press, 2012

উমা

পাভলভ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

সমীরকুমার ঘোষ

মনোরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজের কথা

দ্বিতীয় পর্ব

শুরুর সে দিন ভয়ঙ্কর

ধীরেনবাবু যখন মনোরোগ চিকিৎসা শুরু করলেন, তখন এখানে না আছে চিকিৎসা পরিকাঠামো, না ওষুধ, না চিকিৎসক। যদিও গিরীন্দ্রশেখর বসু ১৯৩০-এর দশকে আর জি কর মেডিকেল কলেজে দেশে প্রথম এ নিয়ে কাজ শুরু করেন।

ধীরেনবাবুর নিজের কথায়, 'বছর চল্লিশ আগে (মানে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে) মনের অসুখের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ঘটে। অর্থাৎ মনোরোগের চিকিৎসা শুরু করি। তখন অবস্থা ছিল খুব খারাপ — চিকিৎসকদের পক্ষে। রাওয়ালফিয়া সারপেনটিনা (সর্পগন্ধা) ছাড়া কোনো ওষুধ ছিল না আমাদের আয়ত্তে। আমি অবশ্য পাভলভ-প্রভাবিত হয়ে উত্তেজক হিসাবে কেফিন (caffeine) ও নিস্তেজক হিসাবে ব্রোমাইড (sodium bromide) ব্যবহার করতাম। এখন (নব্বই দশকে) আমাদের ভাণ্ডারে রোগের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নানারকমের আয়ুধ মজুত। মনকে ভাববাদী দর্শনে প্রভাবিত চিকিৎসকেরা হয়তো মস্তিষ্ক-প্রভাবিত বলে মনে করেন না। কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে মস্তিষ্ক-উত্তেজক-নিস্তেজক ওষুধেরই প্রেস্‌ক্রিপশন করে থাকেন।' আরেক জায়গায় উনি বলছেন, 'যখন পাগলের ডাক্তারি শুরু করি, তখন এখানে কাজ করতাম, আমি আর অজিত দেব, রাঁচিতে ডেভিস, পরে নগেন দে বিলেত থেকে এলো। আর ওষুধই বা কি ছিল, ডিপ্রেশনে কেফিন আর উত্তেজনায় ব্রোমাইড!' আরেক বয়ানে পাচ্ছি, 'সেটা ১৯৫৩ সাল। কলকাতায় তখন প্র্যাকটিশ করছে রাজশেখর বসুর ভাই গিরীন্দ্রশেখর বসু, নগেন দে আর আমি। সে সময় কলকাতা শহরে বা দেশের কোথাও মনোরোগের ওষুধ পাওয়া যেত না। বিদেশ থেকেও আসত না, দেশেও তৈরি হত না। আমি চিকিৎসা করতাম ক্যাফিন দিয়ে। কেউ কেউ শিকড়বাকড়ও ব্যবহার করতেন। কলকাতায় সাইকোট্রপিক মেডিসিন আসতে শুরু করে ১৯৬১ সাল থেকে।' তিনি আরও জানাচ্ছেন, 'আমি একই সঙ্গে সাইকিয়াট্রি এবং সাইকোথেরাপি — দু ধরনের চিকিৎসাই করি। সাইকোথেরাপি মানে হিপনোসিস। কিছু কিছু এমন মস্তিষ্কসম্পন্ন রোগী পাই, যাদের হিপনোটাইজ করা যায় না। আমাদের চিকিৎসার প্রধান হল হিপনোসিস। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে আমি হিপনোটাইজ করে চিকিৎসা করি। তখন অনেকে আমাকে হাতুড়ে ডাক্তার বলেছে। পরে ১৯৫৫ সালে আমেরিকা এই চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দেয়। আরও কয়েক বছর পর এই চিকিৎসা-পদ্ধতি স্বীকৃতি পায় ব্রিটেনে।'

রাজনীতি যোগ-বিয়োগ

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না জড়ালেও বরাবরই ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সমাজ ও রাজনীতি

সচেতন। যুবা বয়সে জড়িয়ে পড়েন সহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনে। অনুশীলন সমিতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। রিভলভার ও গুলিপাচারের জন্য পুলিশের নজরে পড়েন। এর ফলও ভুগতে হয়। গুঁড়োদুধের ব্যবসায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য যখন অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, পুলিশ ভিসা-পাসপোর্ট আটকে দিয়েছিল। কেন না, সন্দেহজনক রাজনৈতিক ব্যক্তি বলে পুলিশের খাতায় নাম ছিল। বহু কষ্টে সে যাত্রা ছাড়া পেয়ে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন। একবার নয়, বেশ কয়েকবার তিনি অস্ট্রেলিয়া যান। ১৯৩০ সাল নাগাদ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বিহারের ভূমিকম্পে ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাশাপাশি বন্ধুদের নিয়ে 'নো গড সোসাইটি' গড়েছেন, দল বেঁধে খেলাধুলো করেছেন, নাটক করেছেন। দেশটাকে জানতে, মানুষ চিনতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। রাজনীতি সংসর্গ নিয়ে নিজেই জানিয়েছেন, 'আমার বন্ধু ও শুভার্থীরা প্রায় সবাই বামপন্থী। কিন্তু আমি কোনোদিনই রাজনীতি করি নি। কোনো দিন করি নি বললে অবশ্য ভুল হবে। ১৯১১ সালে আমার জন্ম। ১৩ বছর বয়সে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে লিখে শপথ নিয়েছিলাম, পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দেব। সে সব গোপন বিপ্লবী সংগঠনে কোনো প্রশ্ন করতে দিত না আমাদের। প্রশ্ন করার নিয়ম ছিল না। কালীমূর্তির সামনে শপথ নিতে হত। সব কিছুই গোপন। আমার এসব ভালো লাগত না। তাই ১৮ বছর বয়সে আমরা তৈরি করলাম নতুন একটি সংগঠন 'নো গড সোসাইটি'। অনুশীলন সমিতিসহ বেশ কিছু বিপ্লবী সংগঠনের লোকজন এতে যোগ দিয়েছিল। তবে এভাবে খুব একটা এগোতে পারি নি। পরে যখন সিপিআই হল, তখন তো ভবানী সেন থেকে শুরু করে সবাই আমার হয় বন্ধু, নয় পরিচিত। কিন্তু সেই যে একবার রাজনীতি করতে গিয়ে দাদা কী জিনিস জেনেছিলাম, ফলে আর কোনো দিনই কোনো দলের সদস্য আর হই নি। যদিও এখনও আমার সব বন্ধু আর সাহায্যকারী, সবাই প্রায় কমিউনিস্ট। শুধু এখানকার কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টি নয়, বাইরের কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও আমি আর্থিক সহায়তা বাদে অন্য নানারকম সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে।'

পাভলভ ইনস্টিটিউট

ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রথমে থাকতেন ভবানীপুরে। সেখানকার বাড়িতে এবং পরে শ্যামবাজারের ফড়িয়াপুকুরের কাছে ১৩২/১এ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে (পরে নাম বদলে বিধান সরণী) পথচলা শুরু করল পাভলভ ইনস্টিটিউট। সেটা ১৯৫২-৫৩ হবে। মনোরোগচর্চা, চিকিৎসা ও মনোরোগীদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার এক নতুন জগৎ খুলে গেল। কলকাতা তো বটেই সারা ভারতেও যা অভিনব। সেই সময় ফ্রয়েডিয়ানদের দাপট প্রবল। ফলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্রয়েড অনুগামীর দল, সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির প্রবল বাধার মুখে পড়লেন। কলকাতায় আয়োজিত মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের এক সভায় জনৈক ডাঃ মাসানি তো রীতিমতো হুমকিই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হয় আপনি আমাদের দলে যোগ দিন, নইলে আমাদের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা যাবেন, এটা যেন খেয়াল থাকে।'

চেহারা ছোটখাটো হলেও ধীরেন্দ্রনাথ বরাবরই ডাকাবুকো। এসব হুমকিকে গুরুত্বই দিলেন না। পাশে পেলেন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষদের। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গুটিকয়েক চিকিৎসক ও অচিকিৎসক বন্ধুকে সঙ্গী করে এগিয়ে চললেন। সেই দুঃসময়ের সাথীদের কোনোদিন ভোলেন নি। প্রায়শই বলতেন, 'এমন বন্ধুভাগ্য খুব কম লোকের হয়। খুব কম মানুষ বন্ধুদের এমন অকাতর, অযাচিত সাহায্য পায়।' এই পাভলভ ইনস্টিটিউটের 'এইমস অ্যান্ড অবজেক্টস' সম্পর্কে লিখেছেন, 'The present complex society has given us many facilities and opened the door of immense possibilities with ever increasing horizon of knowledge, aspiration and fulfilment. But at the same time it has created complexities which sometimes surpass the benefits and comforts of modern life.The infinite possibilities of this technological era are submerged in the vortex of complexities of life which inevitably leeds to a sense of frustration and purposelessness in the society that has been passing through various crisis over unknown to mankind.

Our children are growing up within this gruelling complexities and have to face all the unhealthy stimulus operating within the society. Parents are often getting baffled and perplexed by those complexities and find it most difficult to give their children even a minimum healthy happy childhood. In their perplexities they are sometimes vexing their own children who are getting more and more anxiety-prone or suffering from all sorts of stress disorder, due to unhealthy pressure of imposed competition and insecurity... Our attitude to this social problem is to take a venture to find out the faults in the system or trace out the cause

which are drifting our children, the future builders of our society to frustration and helplessness and therefore, to help the parents as well as the society to find out the process of solution.'

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, সংস্থার নাম 'পাভলভ ইনস্টিটিউট' হিসাবে পরিচিত হলেও, আদতে এটির নাম ছিল 'পাভলভ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল'। হাসপাতাল করার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছে ওঁর ছিল। কিন্তু তা নানা কারণে বাস্তবায়িত হয় নি। যাই হোক, সংস্থার মেমোরেন্ডাম অভ অ্যাসোসিয়েশন -এ অবজেক্ট হিসাবে যা লেখা হয়েছিল, তার প্রথম দুটি পরিচ্ছদ ছিল এইরকম — a) To carry on investigations and study into the all fields of Medicine, specially Psychiatry, for the development of the ideas of I P Pavlov on the Higher Nervous Activity.

b) To promote and maintain Hospitals, Clinics, Laboratories, Study-circles, Libraries, Schools etc. for researches into and investigations, study, teaching and application of Pavlovian concepts and Methodology.

এই পাভলভ ইনস্টিটিউট এবং তার মুখপত্র মানবমন-এর ব্যানারে বহু আলোচনাসভা ও কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। পরে সে কথায় আসছি।

মানবমন প্রকাশ

১৯৬১ সালে প্রকাশ করলেন 'মানবমন' পত্রিকা। কবি অরুণাচল বসু ছিলেন ডাক্তারবাবুর স্নেহধন্য। অকালে প্রয়াত হন। যা নিয়ে অনেক সময়েই ওঁকে দুঃখ করতে শুনেছি। সেই অরুণাচলই নামকরণ করেন 'মানবমন'। খবর শুনে উল্লসিত কমিউনিস্ট বন্ধুদের দল— হীরেন মুখোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত, ভবানী সেন, গোপাল হালদার প্রমুখ। যুবক বয়সে অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরের দিকে আকৃষ্ট হন মার্কসবাদের দিকে। কার্ল মার্কসের '১৮৮৪ ফিলজফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট' ও লেনিনের 'মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম' ছিল প্রিয় বই। কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে ব্যক্তিমন ও সমষ্টিমনের মিলন ও দ্বন্দ্ব নিয়ে তুমুল তর্কে মেতেছেন। সবাইকে বুঝিয়েছেন, পাভলভ না জানলে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বোঝা যাবে না। এত কিছুর পরেও মুক্তমনের মানুষ ধীরেন্দ্রনাথ শত অনুরোধ সত্ত্বেও কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ নেন নি। কারণ তিনি মনে করতেন, সদস্য হলে দলীয় গোঁড়ামি তাঁকেও গ্রাস করবে।

ওঁর আমলে মানবমন-এ ওজনদার লেখকদের গুরুভার সব লেখা ছাপা হত। আর উনি তো নামে-বেনামে লিখতেনই। কণাদ শর্মা, নটবর নন্দী, মনোবিদ ইত্যাদি ছিল ছদ্মনাম। যাঁরা পুরনো মানবমন পত্রিকার পাতা ওল্টাবেন, তাঁরা দেখবেন, এই পত্রিকা ঠিক সাধারণ পাঠকের জন্য ছিল না। প্রবন্ধগুলো বেশ ভারী ধরনের, কিঞ্চিৎ কঠিনও। একদিন ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'উৎস মানুষ' পত্রিকার মতো সাধারণের বোধগম্য করে কেন পত্রিকা করেন নি? ওঁর উত্তর ছিল, মানবমন প্রকাশ করেছিলেন 'টু এনলাইটেন দ্য এনলাইটেন্ড' কারণও ব্যাখ্যা করেন, 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম-নির্ভর মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে এদেশের বামপন্থীদের তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ওঁরা তখনও ফ্রয়েডের ভাববাদ ও দ্বয়বাদাশ্রিত (ডুয়ালিজম) অধিমনোবিদ্যা বা যান্ত্রিক জড়বাদপুষ্ট থর্নডাইক, স্কিনারের ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্বে মজে। ওঁদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদসম্ভূত পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তমূলক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্যই শুরু করি পত্রিকা প্রকাশ।'

আমার কাছে থাকা পত্রিকার কিছু বিশেষ সংখ্যা ও তার বিষয়বস্তুর কথা একটু বলি। তাহলে পাঠকের একটা ধারণা হতে পারে কী ধরনের লেখা পত্রিকার বিষয় হত। সম্পাদকীয়গুলোও দেওয়া হল, যা থেকে খানিক আঁচ পাওয়া যায় ওঁর, পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠানের ভাবনা-চিন্তা কী ছিল।

জানুয়ারি ১৯৭৭। বিষয়: 'জনসংখ্যা-খাদ্য-পুষ্টি : আত্মহত্যা : সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ প্রতীকের মনস্তাত্ত্বিক কারণ'। সম্পাদকীয় কলামে লেখা হয়েছে — 'মানবমন প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো একষট্টির আগস্ট মাসে। প্রথম দুটি সংখ্যার পর উনিশশো বাষট্টি থেকে নিয়মিতভাবে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথম সংখ্যা দুটো বাদ দিলে এই সংখ্যাটিকে ষোড়শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা চলে।

নানা ধরনের অসুবিধে সত্ত্বেও আমরা পনের বছর ধরে পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছি—এজন্য আমরা পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

মানসিক রোগীদের পুনর্বাসন নিয়ে অনেক ভাবনা ছিল ওঁর। তা নিয়ে জানাচ্ছেন, 'স্কিজোফ্রেনিকদের পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রূপায়ণে আমরা সামান্য কিছুটা অগ্রসর হয়েছি।

সর্বজনপরিচিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সংস্থাটির ট্রাস্ট বোর্ডে যোগদান করেছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, শীঘ্রই জমি সংগ্রহ করে আমরা প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করে দিতে পারব। পুনর্বাসন কেন্দ্রটির জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে দুই লক্ষ ও পরবর্তী পর্যায়ে পাঁচ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। আমরা

অতি-প্রয়োজনীয় এই জনহিতকামী প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বসাধারণের সাহায্য সহানুভূতি প্রার্থী। আগামী ১৫ই এপ্রিলের পর এই সংস্থার কার্যক্রমের পূর্বপরিকল্পনা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় তথ্য সাধারণকে জানানো হবে। পাভলভ ইনস্টিটিউট ও মানবমনের সভ্যদের কাছে আমরা এই সংস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য পাব—এই আশা পোষণ করছি।' প্রসঙ্গত জানাই, নানা প্রতিবন্ধকতায় ওঁর এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয় নি।

১৯৮৩ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর। পরিবেশদূষণ সংখ্যা। এতে 'পরিবেশদূষণ: মস্তান'-এর মতো বিষয়ও ঠাঁই পেয়েছে। যা রীতিমতো সাহসিকতার পরিচয়।

জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮৪। বিশেষ অক্টোবর সংখ্যা। সম্পাদক লিখছেন, 'তবে অনস্বীকার্য যে, সেক্স, ক্রাইম, থ্রিলার, মিস্ট্রি ইত্যাদি বিষয়ক বই-এর পাঠকের ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে। আর এও সত্যি যে ভূত, প্রেত, জন্মান্তরবাদ, অলৌকিক ক্ষমতা, দৈব, ভাগ্য, হস্তরেখা বিচার ইত্যাদি সম্পর্কিত এবং এই সবের পোশাকী নাম প্যারাসাইকোলজি (Telepathy, Clairovoyance ইত্যাদি) বিষয়ক বই ও পত্রিকার চাহিদা বেড়েছে। পোশাকী না বলে বিজ্ঞান-গন্ধী নাম বলাই বোধ হয় উচিত। এ যুগে বিজ্ঞান কথাটি সম্ভ্রম উদ্রেক করে। গড ও গডম্যনদের সংখ্য আগের থেকে অনেক বেড়েছে। আমাদের দেশের (সব দেশেরই প্রায়) 'ম্যাস মিডিয়া' কুসংস্কার ও বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না — এই সব প্রচারে পরোক্ষ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লক্ষাধিক বিক্রি হয় এমনি সব পত্রপত্রিকায় অলৌকিক ঘটনার বিবরণ থাকে, অসম্ভাব্যতার দাবীদার 'গডম্যান'দের অণিমা লঘিমা ইত্যাদির বিজ্ঞাপন থাকে; ভক্তদের প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন থাকে। ...ব্যক্তিমানুষ নিজেকে দুর্বল মনে করছে, অসহায় মনে করছে।

মানুষ মাত্রেই আজ ভীত, সন্ত্রস্ত— ভূতে পাওয়া রোগী। তাই, হয় তারা রগরগে সেক্স, নিষ্ঠুর ক্রাইম এবং একই সঙ্গে অলৌকিক শক্তিধরদের কাহিনী পড়ে নিজেকে সজীব রাখার চেষ্টা করছে। আমরা ২৪ বছর ধরে যে পথে চলেছি, সেই পথেই চলব। আমাদের প্রচার না বাড়লেও আমরা জিঘাংসা, রিরংসা ও অলৌকিক রহস্যময়তা এবং সংস্কারান্ধতার (obscurantism) বিরুদ্ধে লিখেই চলব।' এই সংখ্যায় 'পরামনোবিদ্যা প্রসঙ্গে' বা 'বিজ্ঞানবিরোধিতার উৎস সন্ধানে'র মতো লেখার পাশাপাশি 'সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ: গৌরীবাড়ি'ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, উত্তর কলকাতার গৌরীবাড়িতে কুখ্যাত মাস্তান হেমেন মণ্ডল দীর্ঘদিন নানা দুষ্কর্ম চালাত। ওর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রুনু গুহনিয়োগী। একদিন পাড়ার লোকজন ক্ষেপে গিয়ে হেমেনকে পাড়াছাড়া করে দেয়। জনরোষে হয়ত সেদিনই মারা পড়ত, যদি না রুনু বাঁচাত।

১৯৮৬-র বিশেষ অক্টোবর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'বিচ্ছিন্নতা ও বিপ্লব এবং বিচ্ছিন্নতা ও বাতুলতা' নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বিচ্ছিন্নতা নিয়ে তিনি কতখানি ভাবিত, এটি পড়লেই বোঝা যায়। বিচ্ছিন্নতা-সমস্যা নিয়ে ওঁর দুটি বইও আছে।

(ক্রমশ)

উমা

দ্বাদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক বক্তৃতা

১৯ নভেম্বর (শনিবার) বিকেল ৫টায়
বিষয় ঃ
বিজ্ঞান আর কুসংস্কার, দুই-ই যখন মুনাফা উৎপাদনের কাঁচামাল
বক্তা —
মাননীয় অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়
স্থান—
মহাবোধি সোসাইটি সভাঘর
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩
প্রবেশ অবাধ

সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আমাদের কি শেখায়

সুশান্ত মজুমদার

ভারত স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের স্মৃতিকে সঙ্গে করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে অ্যালবাম বন্দী করতে পেরেছিল দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতা আর পরিশ্রমী কৃষক ও ফিল্ডওয়ার্কারদের মিলিত প্রচেষ্টায়। শুধু ভারতবর্ষ, চিন, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কা নয়, প্রায় গোটা এশিয়া জুড়ে ষাট ও সত্তর দশকে সবুজ বিপ্লব কোটি কোটি মানুষকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে এই সংখ্যায় আমরা সবুজ বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ রাস্তায় ভারতের পথ চলার অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল—'যদিও পূর্ববর্তী চার দশকে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩৯ শতাংশ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। এই পরিসংখ্যান অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য হ্রাসকেই নির্দেশ করে।' মূলত খাদ্যশস্য আমদানি করেই এই ঘাটতি মেটাতে হত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার গুরুত্ব হ্রাস করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে দেখা যায় ভারত খাদ্যশস্যের আমদানি নির্ভরতা কাটাতে পারেনি। ইতিমধ্যে খাদ্যশস্যের (চাল, গম, বজরা ইত্যাদি তণ্ডুল জাতীয় শস্য, ডাল বাদে) উৎপাদন বেড়েছে ৪৮.৪ থেকে ৬৪.০ মিলিয়ন টন (**এরপর থেকে মিট**)। ১৯৫৭ সাল থেকে পিএল-৪৮০ প্রকল্পের অধীনে ভারত নিরবচ্ছিন্নভাবে আমেরিকা থেকে বাৎসরিক ৩-৪ **মিট** খাদ্যশস্য আমদানি করতে থাকে। ষাটের দশকের শুরুতে ভারত অতিরিক্ত খাদ্যশস্য অর্থাৎ গম আমদানি শুরু করে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় থেকেই ভারত কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে পতিত জমি উদ্ধার, সেচ, সার (রাসায়নিক ও জৈব উভয় ধরনের), কীটনাশক এবং উন্নত মানের বীজের জোগান বৃদ্ধির চেষ্টা করে গেছে। ষাটের দশকের গোড়া থেকে ভারতে খাদ্যশস্যের জোগানে টান ধরতে থাকে। এই সংকট চরমে ওঠে পরপর দু'বছর (১৯৬৫-৬৬) ব্যাপক খরা জনিত কারণে। ১৯৬৪-৬৫ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন যেখানে ছিল ৭৬.৯৪ মিট, সেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালে তা হয় মাত্র ৬২.৪ মিট এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ৬৫.৮ মিট। এই সময়ে ভারতবর্ষে আবার দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল। আমাদের বয়সী যারা তাদের সকলেরই মনে আছে ঊনিশ-শ ঊনষাট আর ছেষট্টি সালের খাদ্য আন্দোলনের কথা। ছেষট্টির আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত নুরুল ইসলামের কথা। সেবার আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ গম (১৯৬৫-৮.০০ মিট, ১৯৬৬-১০.০০ মিট এবং ১৯৬৬-৮.০০ মিট) আমদানি করে রক্ষা পাওয়া যায়। তখন অনেক সাহেব পণ্ডিত ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, আগামী দিনগুলিতে খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎবাণী ভুল প্রমাণিত করে, পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পঁচিশ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে ভারতবর্ষ নিজে থেকেই ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর পি এল-৪৮০ প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে।

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই চমকপ্রদ সাফল্যের কারিগর হিসাবে সকলেই এম এস স্বামীনাথনের নাম করেন। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানীই এককভাবে এই বিরাট কর্মকাণ্ডে সফল হতে পারেন না। তার জন্য প্রয়োজন অর্থ, অসংখ্য বিজ্ঞানকর্মী, গবেষণাগার আরও কত কি? ভারতের মতো বহু রাজ্য সমন্বিত দেশে পুরোদস্তুর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন এই লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব। দেশের মূল নীতি ও আদর্শ যদি বিজ্ঞানীদের সহায় হয় তাহলেই এই কর্মকাণ্ডে সাফল্য আসতে পারে। ভারতের কৃষির এই উত্থান, যা সাধারণভাবে সবুজ বিপ্লব নামে খ্যাত তার মূল কারিগর হিসাবে এম এস স্বামীনাথন ছাড়াও যে নাম দুটি উচ্চারিত হয় তাঁরা হচ্ছেন চিদাম্বরম সুব্রহ্মণ্যম এবং জগজীবন রাম। এর মধ্যে সবুজ বিপ্লব পরিকল্পনা ও ভিতটা স্থাপন করেছিলেন সুব্রহ্মণ্যম আর তার সৌধটা সম্পূর্ণ করেছিলেন জগজীবন রাম।

পদার্থবিদ্যার ছাত্র সুব্রহ্মণ্যম জুন ১৯৬৪ থেকে মার্চ ১৯৬৭ পর্যন্ত ভারতের কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী

এবং পরবর্তীকালে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যের মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে সুব্রহ্মণ্যম বৈজ্ঞানিক মানসিকতাযুক্ত একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে গোটা দেশে পরিচিতি লাভ করলে ১৯৬২ সালে নেহরু তাকে ইস্পাত ও ভারী শিল্পমন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নিয়ে আসেন। সংকট মুহূর্তে লালবাহাদুর শাস্ত্রী তার হাতে কৃষি দপ্তরের দায়িত্ব সমর্পণ করেন। দক্ষ প্রশাসক সুব্রহ্মণ্যম খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের কৃষি নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এই পরিবর্তন ছিল প্রতিষ্ঠানগত, তাই এর প্রভাব শুধুমাত্র কৃষিনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও তার প্রভাব ছিল। এই কাজে তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও শক্তির উৎস ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

দুনিয়াজোড়া বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃত্ববোধ — কৃষি ক্ষেত্রে সেই সময়কার প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন বোঝার আগে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক বিজ্ঞানীরা সেই সময় কি করেছিলেন। ১৯৫০-৫১ সালে দেশে হেক্টর প্রতি ধান ও গমের উৎপাদন ছিল ৭ কুইন্টালের কাছাকাছি। ২০১৭ সালে ধান ও গমের ক্ষেত্রে এটাই যথাক্রমে ২৫.৫০ ও ৩২.১৬ কুইন্টাল। ২০১৩ সালে একটি প্রবন্ধে স্বামীনাথন লিখেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সার ও সেচের প্রাপ্ত ব্যবস্থা করেও এদের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল না। তাই পঞ্চাশের দশক থেকেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত উন্নত মানের ধান ও গমের বীজের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেমন জাপোনিকা (japonica) নামক উন্নত মানের ধানের বীজ নিয়ে স্বামীনাথন নিজেই গবেষণা করেছেন। ১৯৫৫ সালে বিখ্যাত জাপানি গম বিশেষজ্ঞ এইচ খিরা মারফত স্বামীনাথন সফল সেমি-ডোয়ার্ফ জাতীয় আমেরিকান গমের সন্ধান পান। অরভিল ভোগেল নামক এক কৃষি বিজ্ঞানী তখন এই ভ্যারাইটির গমের ওপর ওয়াশিংটন রাজ্যের একটি খামারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। স্বামীনাথন ডাঃ ভোগেলের কাছে নমুনা পরীক্ষার জন্য বীজ চাইলে তিনি তা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সঙ্গে এটাও লেখেন যে এই গম যেহেতু সেখানকার শীতকালীন ফসল তাই ভারতের আবহাওয়ায় তার আশানুরূপ ফলন নাও হতে পারে। স্বামীনাথন যেন বিজ্ঞানী নরম্যান বরলোগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কারণ তিনি মেক্সিকোতে বসন্তকালীন গমের চাষে সফল হয়েছেন। স্বামীনাথন এরপর বরলোগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারপরের ইতিহাস আমাদের জানা।

বিদেশী বীজের স্বদেশে প্রয়োগ ঃ ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে বরলোগ প্রথম ভারতে আসেন এবং উত্তর ভারতের গম প্রধান এলাকাগুলি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘুরে দেখেন। এরপর ১৯৬৩ সালে প্রথম মেক্সিকান ভ্যারাইটির গমের বীজ ভারতে আসে এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। দেখা যায়, এই জাতীয় গমের সফল উৎপাদনের জন্য দেশীয় গমের জন্য ব্যবহৃত কৃষি পদ্ধতিতে (যেমন বীজ বপনের গভীরতা, প্রথম সেচের সময়কাল) নানান পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষার পরে কৃষি পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রয়োগ দ্রুত সম্পূর্ণ করা হয়। পরীক্ষায় এটাও দেখা যায় যে বিদেশী বীজের গমে ভালো চাপাটি হয় না। সাহায্যে এগিয়ে আসেন বায়োকেমিস্ট অস্টিন। বিদেশী বীজের সেই খামতিও বিজ্ঞানীরা মেরামত করেন। এইভাবে ১৯৬৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মাঠেঘাটে ব্যাপকভাবে নতুন গমের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনুশীলন করে গিয়েছিলেন।

আমরা যাকে সবুজ বিপ্লব বলি, তা আসলে কৃষিক্ষেত্রে একটি সার্বিক প্রযুক্তি বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূল প্রযুক্তিগত উপাদান চারটি— সেচ, উন্নত বীজ, সার এবং কীটনাশক। কিন্তু এর সফল বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যিক হচ্ছে ছোট-বড় সব ধরনের কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়, তাদের নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষিত করে তোলা, ঋণ ও কৃষকের জন্য ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা। এর কোনোটিতে ঘাটতি হলে সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ হবে। হার্ভাডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক (বর্তমান ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের) আশুতোষ ভার্সনয় (Ashutosh Varshney) ১৯৮৯ সালে সবুজ বিপ্লবের ওপর একটি প্রবন্ধে (*Ideas, interest and institutions in policy change: Transformation of India's agricultural strategy in the mid-1960s*) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন কিভাবে দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সুব্রহ্মণ্যমের কৃষি মডেল কাজ করেছে।

নেহরু থেকে শাস্ত্রী ঃ কৃষিনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বদল — ভার্সনয়ের মতে সুব্রহ্মণ্যমের কৃষি মডেলের তিনটি মূল উপাদান ছিল ঃ অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংগঠনিক। এখানে অর্থনৈতিক উপাদান হচ্ছে কৃষি পণ্যের লাভজনক মূল্যের ব্যবস্থাপনা, যাতে কৃষকরা অধিকমাত্রায় ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। স্বাধীনতার পরে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে কৃষকের লাভের দিকটা সামগ্রিক

মূল্যমানকে ধরে রাখার স্বার্থে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। 'মূল্য কাঠামোতে খাদ্যশস্যের অবস্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ ...তাই এর দাম যাতে দরিদ্র অংশের নাগালের মধ্যে থাকে তার জন্য খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা জরুরি।' পরিকল্পনাকারদের বক্তব্য ছিল কৃষকের অবস্থা ফেরানোর জন্য বিদ্যুৎ, সেচ, বীজ ও সার (manures) ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ দরকার। (1st Plan, Chapter 11, Food Policy) কিন্তু বিস্ময়করভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মুখবন্ধে 'কৃষি' শব্দটাই হারিয়ে গেল। ধরেই নেওয়া হল যে আমরা খাদ্যশস্য আমদানি করেই চলব— "*...increased production of food and raw materials must remain for several years to come a major desideratum* (অভাব)."

প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার। আধুনিক বীজের ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু নীতি নির্ধারকরা নন, অনেক বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও দ্বিধা ছিল। এ ক্ষেত্রে সুব্রহ্মণ্যমের বক্তব্য ছিল বিদেশের মাটিতে যদি সাফল্য এসে থাকে, তা হলে ভারতে তা সম্ভব নয় কেন? রাসায়নিক সারের ব্যবহারে নেহরুর কিছুটা দ্বিধা ছিল। তিনি একে বিপজ্জনক প্রবণতা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন যদিও তার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে রাসায়নিক সারের উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছিল। ১২ আগস্ট ১৯৫৬ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে লেখা পাক্ষিক পত্রে তিনি চিনের উদাহরণ দিয়ে লিখেছিলেন যে সে দেশ খুব বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেও ভারতের থেকে দ্রুত কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে চিনে মোট কম্পোস্ট সার ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও, দ্রুত তারা রাসায়নিক সারের ব্যবহারও শুরু করেছিল (১৯৬০ সালে ছিল প্রতি হেক্টরে ৫.৪ কেজি)।

এই তথ্য নিশ্চয় নেহরুর অজানা ছিল। সুব্রহ্মণ্যমের যুক্তি ছিল পৃথিবীতে হেক্টর প্রতি রাসায়নিক সারের গড় ব্যবহার (তখন) যেখানে ৭.৮ কেজি, জাপানে ১২৪ কেজি, প্রতিবেশী দেশ **শ্রীলঙ্কায় ৬.২৫ কেজি** (পাঠক লক্ষ্য করুন) সেখানে ভারতে মাত্র ২-৩ কেজি। সুতরাং, ভারতকেও রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেকটা বাড়াতে হবে। নেহরুর চিন্তাভাবনায় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ভারতের গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। তাই তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি সংস্কার এবং সমবায় ও পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু, বাস্তবে আমরা জানি দিল্লীতে নেহরু বা তার পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের চিন্তাভাবনা যাই থাক, রাজ্যে রাজ্যে এইসব ধারণার সামান্যই প্রয়োগ ঘটেছিল। সুব্রহ্মণ্যমের বক্তব্য ছিল কবে ভূমি সংস্কার এবং সমবায় ব্যবস্থা সফল হবে ততদিন কি খাদ্যের জন্য পরনির্ভর হয়ে থাকতে হবে?

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে দিল্লীর ক্ষমতার অলিন্দে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন ঘটল, তা হচ্ছে পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্ব হ্রাস। নেহরুর আমলে পরিকল্পনা কমিশনের সচিব আর ক্যাবিনেট সচিব থাকতেন একই ব্যক্তি। যেহেতু ক্যাবিনেট সচিব গোটা দেশের আমলাকুলের শীর্ষে অবস্থান করেন, তাই পরিকল্পনা কমিশনের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। শাস্ত্রী দুটো পদকে আলাদা করেন। শুধু তাই নয়, তার সময়েই তৈরি হয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রথম সচিব হলেন পিগু (Pigou) ও কেইনসের ছাত্র লক্ষ্মীকান্ত ঝা। শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্যম, ঝা, স্বামীনাথন এবং তৎকালীন কৃষি সচিব শিবরমণ মিলে ভারতীয় কৃষি পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন আনলেন। ১৯৬৫ সালে তৈরি হল এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস কমিশন এবং ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। আমরা জানি, প্রথমটি কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করে আর দ্বিতীয়টি সহায়ক মূল্যে কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চালু হওয়ার ফলে সকল কৃষক লাভবান হলেন। আর যারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারলেন তারা দুভাবে লাভবান হলেন।

কিন্তু সাধারণ কৃষক নতুন কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করবেন কিভাবে? এতদিন গ্রামসেবকদের দায়িত্ব ছিল গ্রামবাসীর উন্নত ও পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সহায়ক ভূমিকা পালন করা। যেমন উন্নত চাষাবাদ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির সুবিধা সম্পর্কে তাদের অবহিত করা, আবার স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি, টিকাকরণ বা শিশুকল্যাণ কর্মসূচি বিষয়ে সকলকে সচেতন করা। যে সমস্ত জেলায় নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ হবে, সুব্রহ্মণ্যম সেখানকার গ্রামসেবকদের আধুনিক কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সত্তরের দশকে আসেন পুরোদস্তুর কৃষি সহায়করা। সবুজ বিপ্লবের সাফল্যে এদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুব্রহ্মণ্যমের কৃষি মডেল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরাট বিতর্কের জন্ম দেয়। অর্থদপ্তর এবং যোজনা কমিশন এর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল নতুন মডেল অনুসারে খাদ্যশস্যের দাম বাড়লে তার প্রভাব অর্থনীতির সর্বস্তরে পড়বে। বহু জিনিসের দাম বাড়বে।

দ্বিতীয়ত কৃষিতে অধিক বিনিয়োগ মানেই অন্যত্র বিনিয়োগ ছাঁটাই করতে হবে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানি মানে বিদেশী মুদ্রার ওপর চাপ বাড়বে। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে ক্যাবিনেট বৈঠকে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী টি কৃষ্ণমাচারির সঙ্গে সুবহ্মণ্যমের কথা কাটাকাটি হয়। ১৯৬৫ সালে দুর্গাপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেস সোসালিস্ট গ্রুপের সদস্যরা অভিযোগ তোলেন কৃষিমন্ত্রী দলের ঘোষিত নীতি থেকে সরে আসছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী সব অভিযোগ সুকৌশলে এড়িয়ে এমন একটা সমঝোতা প্রস্তাব পাশ করান, যাতে মূল লক্ষ্য থেকে কৃষি মন্ত্রীকে সরতে না হয়।

শাস্ত্রী থেকে ইন্দিরা গান্ধী — ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে শাস্ত্রীর নীতিতেই আস্থা রাখেন। চতুর্থ পরিকল্পনার সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে 'কৃষি খাতে উন্নয়নের গতি শিল্প, রপ্তানি এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে বৃদ্ধির সীমানা নির্ধারণ করে এবং অর্থনৈতিক তথ্য সামাজিক স্থায়িত্ব অর্জনে ও জনসাধারণের আর পুষ্টির উন্নয়নেও তা প্রধান অবলম্বন।' ফলস্বরূপ চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে কৃষি গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৬৫ সালে ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে এর অধীনে আনা হয়। একাধিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে টেলিভিশনে 'কৃষি দর্শন' সম্প্রচার শুরু হয়। এসবেরই লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন। বস্তুত, খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতা তখন সমগ্র দেশবাসীর কাছে ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণটা হচ্ছে, ১৯৬৬ সালে ভারতে যখন খাদ্যের চরম সঙ্কট, সেই সময়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ভারতের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়ে আমেরিকা ছোট ছোট কিস্তিতে গম রপ্তানি শুরু করে। একে বলা হত — 'ship to mouth' existence। ইন্দিরা গান্ধী বুঝেছিলেন যে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হলে চাই কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বোঝা গিয়েছিল এই স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা।

ষাটের দশকের ভারত আর বর্তমান শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা আমাদের কি শিক্ষা দেয়?— গত সংখ্যায় লেখাটা শুরু হয়েছিল, সরকারি নির্দেশে দেশ জুড়ে হঠাৎ জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে শ্রীলঙ্কার কৃষি উৎপাদন বিপর্যয় এবং সেখান থেকে উদ্ভূত সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্দশার আলোচনায়। মনে হয়, এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে পাঠক খানিকটা আন্দাজ করতে পারছেন যে কোটি কোটি জনসংখ্যার দেশে কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে গেলে, কত ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এবং এই প্রস্তুতিতে প্রতিষ্ঠানের (ইনস্টিটিউশন) গুরুত্ব, তা বৈজ্ঞানিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক, কত গভীর। দ্বিতীয়ত, কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য পেতে গেলে নীতির ধারাবাহিকতা আবশ্যিক। ভারতবর্ষে শাস্ত্রীর সময় থেকে দীর্ঘকাল ভারতের কৃষিনীতি তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিচারের ভার প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানীদের হাতে ছাড়তে হবে। বিজ্ঞানীদের সরিয়ে রেখে সরকার যদি কতিপয় অসরকারি সংস্থার পরামর্শ মেনে দেশের নীতি নির্ধারণ করে তাহলে বিপর্যয় অনিবার্য। শ্রীলঙ্কায় সরকার এবং পরিবেশবাদীদের অতিসক্রিয়তার কারণে সেই দুর্ভাগ্যজনক বিপর্যয়টা ঘটেছে। অসরকারি সংস্থাগুলির কাছ থেকে সমাজ যেটা আশা করে, সেটা হচ্ছে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তারা একসঙ্গে কাজ করবে। তাদের চোখ-কান হিসাবে মাঠঘাটের অভিজ্ঞতা আদানপ্রদান করবে। বহুকাল এটাই হয়ে এসেছে। এটাই কাম্য।

উল্লেখযোগ্য তথ্যসূত্র ঃ

১। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি পাওয়া যাবে— https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/planrel/fiveyr/index1.html

২। M.S. Swaminathan: Genesis and Growth of the Yield Revolution in Wheat in India:Lessons for Shaping our Agricultural Destiny, Agric Res (September 2013) https://link.springer.com/article/10.1007/s40003-013-0069-3

৩। আশুতোষ ভারসনয়ের প্রবন্ধের জন্য JSTOR গিয়ে রেজিস্ট্রি করে লগ ইন করতে হবে।

৪। চিনের সার ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের জন্য Yuxan Li-র প্রবন্ধটি পাওয়া যাবে— https://www.researchgate.net/publication258443978 An Analysis of China's Fertilizer Policies Impacts on the Industry Food Security and the Environment

উমা

কোভিড-এর পরে

ভবানীপ্রসাদ সাহু

এবছর, ২০২২-এ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিল ১১,২৭,৮০০ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ফর্ম পূরণ করেও পরীক্ষা দেয় নি ২৯,০২৫জন। এতজন পরীক্ষা না দেওয়ার পেছনে বড় কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বিশেষত ছাত্ররা, কোভিডজনিত দীর্ঘ লকডাউন, পারিবারিক দারিদ্র্য, স্কুল বন্ধ থাকার জন্য বাইরে কাজ করতে চলে গেছে বা অন্য কোনো কাজে যোগ দিয়েছে। অনেক কিশোরীর বিয়েও হয়ে গেছে। গত বছর মাধ্যমিকে শতকরা ১০০ জনকেই পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল—কোনো পরীক্ষা না দিয়েই। এইসব কিশোর-কিশোরীরা ভেবেছিল এবারও বুঝি ঐভাবে পরীক্ষা না দিয়েই পাশ করে যাবে। তাই তারা বাইরে থেকে এসেও ফর্ম পূরণ করেছিল, শিষ অব্দি পরীক্ষা হওয়ায় তারা পরীক্ষায় বসে নি, কারণ কোনো ধরনের প্রস্তুতিই তাদের ছিল না। এ ছাড়াও দেখা গেছে, পরীক্ষার্থীদের কেউ কেউ উত্তরপত্রে কিছুই লেখেনি, অর্থহীন আঁকিবুকি কেটেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা—এতদিন যা দেখা যায় নি, উত্তরপত্রে কোনো কোনো ছাত্র চূড়ান্ত অশ্লীল কথাবার্তা গালাগালি লিখে গেছে।

কোভিড পরবর্তী সময়ের এ ধরনের একটি খণ্ডচিত্র থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাবের বিষয়ে কিছু আঁচ করা যায়। বিশ্ব জুড়েই এই ছবি। হয়তো একটু রকমফের আছে। এই ধরনের নেতিবাচক প্রভাব বেশি পড়েছে দরিদ্র দেশগুলির ওপর---দরিদ্র-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের উপর।

২০১৯-এর ডিসেম্বরে চীনের হুপেইতে কোভিড-১৯-এর প্রথম রোগী। তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৃত্যু। ২৩ মার্চ, ২০২০, এদেশে আচমকা ঘোষিত হল লকডাউন। সব কিছু বন্ধ—যানবাহন, কলকারখানা, মন্দির-মসজিদ, অফিস কাছারি। শুধু খোলা থাকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাফাইয়ের কাজ আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশি কাজকর্ম। কত মানুষ কর্মহীন হলেন, কত পরিবার তীব্র আর্থিক অনটনে পড়ল, কত পরিযায়ী শ্রমিক কোভিড-এ নয়—যাত্রাপথেই মারা গেলেন। জুন, ২০২২-এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কোভিডে আক্রান্ত মোট মানুষের সংখ্যা বিশ্বে দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি ৫২ লক্ষেরও বেশি, মারা গেছেন ৬৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখন প্রকোপ অনেকটা কমলেও, একেবারে চলে যায় নি। আর এসব কিছুর ফলে নানা ক্ষেত্রে নতুনতর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ভিন্ন ধরনের কিছু প্রভাব পড়েছে, ভিন্নতর অনেক উপলব্ধিও ঘটেছে।

এখন দেশের শিক্ষিতরা তো বটেই, একেবারে নিরক্ষর মানুষেরাও নতুন কিছু শব্দ শিখেছেন—কোভিড, করোনা, ভাইরাস, লকডাউন। সঙ্গে আছে একটু শিক্ষিতদের জন্য পরিযায়ী, ইমিউনিটি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, বিচ্ছিন্ন বাস বা হোম আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদির মতো নানা শব্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি।

শুধু নতুন শব্দ নয়, কোভিড অতিমারীর সময় মানুষের ব্যবহার কথাবার্তার ধরণও পাল্টে ছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পরিচিতদেরও জ্বর হলেই সন্দেহ হত 'কোভিড' এবং এতদিনের ঘনিষ্ঠতা বা পরিচিতি ভুলে তার সঙ্গে শারীরিকভাবে দেখা করার কথা চিন্তাও করা হয় নি। আগে যেখানে কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে বা অন্তত বাড়িতে দেখা করার জন্য সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কোভিডের সময় না-দেখা করার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে। এক ধরনের স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অমানবিকতা, এমনকি হিংস্র আচরণও প্রকাশ পেয়েছে। এতদিনকার সৌহার্দ্যের মুখোশ খুলে বেরিয়ে এসেছিল 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'-র মতো মানসিকতা, বিশেষত মধ্যবিত্ত, স্বচ্ছল, তথাকথিত শিক্ষিত-আলোকপ্রাপ্তদের মধ্যে। সবচাইতে অমানবিক ঘটনা প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখতে না দেওয়া। কোভিড এখন প্রায় যাওয়ার মুখে, তখন অনেকের মধ্যেই ঐসব পরিচিতদের ঐ ধরনের ব্যবহারের স্মৃতি থেকেই গেছে।

দীর্ঘ লকডাউনের পরবর্তী একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল প্রতি পাঁচজন ব্যক্তির দু'জনই চরম উদ্বেগের শিকার এবং শতকরা ১০ জনেরও বেশি মানুষ হতাশায় ভুগছেন। প্রতি চারজনের তিনজনই প্রবল মানসিক চাপের মধ্যে আছেন বলে জানা যায়। আর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে দু'জনেরই সাধারণ নানা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত—এটি আমাদের দেশে প্রায় দু'হাজার মানুষের মধ্যে করা একটি গবেষণার

নির্যাস। এখন ধীরে ধীরে হয়তো কোভিডের তীব্রতা কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকেই মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠছেন ও উঠবেন। কিন্তু আরো বহুজনের মধ্যে এবং বহু পরিবারে তার ছাপ দীর্ঘদিন ধরে থাকবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোভিড-অতিমারী একটি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমবেশি দু'বছর বন্ধ রেখে অনলাইনে পড়াশোনা চালু রাখা হয়েছিল। কিন্তু এটি যে সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ হয় নি তা প্রমাণিত। ২০১৭-১৮-এর জাতীয় সমীক্ষা অনুসারে এদেশের শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ মানুষের ইন্টারনেট সুবিধা আছে এবং ৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের শতকরা মাত্র ৮ ভাগেরই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ দুটোই রয়েছে। স্পষ্টত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কাছে অনলাইন শিক্ষা ছিল কল্পনার অতীত। এর প্রভাব পড়েছে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদেরও অনেকেই নিজের নাম পর্যন্ত ভালভাবে না লিখতে পারা, সাধারণ যোগবিয়োগ গুণভাগ করার অক্ষমতার মধ্যে।

সরকারিভাবে প্রশাসনও ছিল অপরিণামদর্শী ও জনস্বার্থ থেকে শতহস্ত দূরে। বাস্তব পরিস্থিতির বিচার না করে আচমকা লকডাউনের সাহায্যে সব কিছু বন্ধ করা ছিল যেমন, তেমনি সবার জন্য অনলাইন শিক্ষা, তারপরেও পরীক্ষা না দিয়ে সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়ার মতো নানা ধরনের কর্মসূচি। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে। আগে তো বৈষম্য ছিলই, কিন্তু এখন তা অতি প্রকট। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, বহুসংখ্যক শিক্ষার মানে অনেক পিছিয়ে—সঙ্গে তাদের অনেকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করে যাওয়ার সুবিধাবাদী মানসিকতা।

অন্যদিকে অনলাইন ক্লাসের জন্য স্মার্টফোন না পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে; ছেলে বা মেয়েকে স্মার্টফোন কিনে দিতে না পারার হতাশা ও হীনমন্যতা থেকে বাবা-র আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। কোভিড-অতিমারীর এই ভয়াবহ প্রভাবের ছাপ সংশ্লিষ্ট পরিবারে থেকে যাবে দীর্ঘ দীর্ঘকাল। দীর্ঘ লকডাউনের পরিবেশে কিছু শিশু কিশোর কিশোরীদের স্মার্টফোনে আসক্তি আর অনলাইনে খেলার নেশা বেড়েছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কৈশোরের আত্মকেন্দ্রিকতা, সমাজবিচ্ছিন্নতা, হতাশা, সৃজনশীল ভাবনার অবনমন ইত্যাদিও। আর্থসামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমনই কিছু কিশোরকিশোরী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে শিক্ষাগত মানের অবনমন, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, তথা সামাজিক ও পেশাগত হীনতর অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার মুখে—যা আবার চক্রাকারে ডেকে আনবে হতাশা, বিচ্ছিন্নতা এবং হয়তো হিংসা, যুক্তিবোধহীনতা ক্রিয়াকর্ম ও নানা ধরনের মানসিক বৈকল্য। কোভিড অতিমারীর ছাপ আগামী কয়েক বছরের সময়কাল ধরে এইভাবেই প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা।

অন্যদিকে জুলাই, ২০২২-এ অক্সফ্যামের দেওয়া একটি হিসেবে দেখা গিয়েছিল বিশ্বে প্রতি মিনিটে ক্ষুধার কারণে মৃত্যু হয় ১১ জনের, আর ঐ সময় কোভিডে মৃত্যু হচ্ছিল প্রতি মিনিটে ৭ জনের। রোগের বিচারে এটি ভয়াবহ হলেও, ক্ষুধার কারণে বিশ্বে মৃত্যু কিন্তু বিরামহীন। অন্যদিকে কোভিডের কারণে মৃত্যু সাময়িক। ইতিমধ্যেই তা ন্যূনতম হয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্নটি ওঠে যে, ক্ষুধার কারণে (যক্ষ্মা, ডায়ারিয়া ইত্যাদির কারণেও) মৃত্যু ঘটে মূলত দরিদ্র মানুষের। অন্যদিকে কোভিডে মৃত্যুর সিংহভাগই আর্থসামাজিক অবস্থান হচ্ছে ওপরের দিকে। কোভিড নিয়ে উন্মাদনা এত প্রবল হওয়ার অন্যতম কারণ (প্রধান নয়) এটিও। এর ফলে বৃহৎ পুঁজিপতি ও কর্পোরেট হাউসগুলি অতিমারীর সময়ে সীমাহীন মুনাফা করেছে (কারণ মূল ক্রেতা এঁরাই, দরিদ্ররা নয়) এবং তা ঘটেছে সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষদের আর্থিকভাবে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় ফেলার মধ্যে দিয়ে। এ কারণেই কোভিডের মাত্রাতিরিক্ত আতঙ্ক ছড়ানো, পরবর্তীকালে ভ্যাক্সিনকে ঘিরে আকাশচুম্বী প্রচার ও চাহিদার সৃষ্টি করা। আর্থিক এই বৈষম্যের ছাপ দীর্ঘ, দীর্ঘদিন থেকে যাবে।

২০১৯-এর তুলনায় ২০২০-তে দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ। উল্লেখ্য, তার আগের বছরগুলিতে কিন্তু এই হার ধীরগতিতে হলেও কমছিল। একইভাবে ভারতে ৯৭ ভাগ মানুষের আয় এই সময়কালে কমেছে, আট কোটি পরিবার নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে গরীব হয়েছে।

এর পাশাপাশি সম্পূর্ণ অতিমারীর বিপর্যয়কে কাজে লাগিয়ে ও তার সুযোগ নিয়ে, পৃথিবীর উপরতলার শতকরা এক ভাগ মানুষ শেয়ার বাজারে তথা ব্যবসায়িক মুনাফায় এই সময় আয় করেছে ১১ লক্ষ কোটি ডলার—বাড়তি! শুধু আমেরিকার দশজন ব্যবসায়ী উপার্জন করেছে ৫০,০০০ কোটি ডলার। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। ভারতের ধনীতম ব্যবসায়ীটি যখন ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা রোজগার করেছে,

তখন ভারতের ২৫ শতাংশ পরিবারের আয় ঐ সময় মাসিক ৩০০০ টাকা বা নীচে নেমে গেছে। মে, ২০২২-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্বে অতিমারীর সময় প্রতি ৩০ ঘণ্টায় একজন ধনকুবের হয়েছে। ঐ সময় দরিদ্র হয়েছে ১০ লক্ষ মানুষ। প্রতি দু'দিনে ধনকুবেরের সম্পদ বেড়েছে ১০০ কোটি ডলার।

এর অর্থ ঐ ব্যবসায়ীটি যখন বিদেশে কোটি কোটি টাকার প্রাসাদ কিনছে, বিলাসবহুল নিজস্ব বিমানে পারিবারিক ভ্রমণে যাচ্ছে, ওড়াচ্ছে লক্ষ কোটি টাকা (এবং অবশ্যই তার ভাগ পাচ্ছে এ দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক কিছু নেতাও)—তখন তাদের বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই একটি পরিবারে সবার জন্য শুধু ডালভাত কেনার সামর্থ্য নেই, নির্ভর করতে হচ্ছে ঐ সব রাজনৈতিক নেতাদের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষান্ন, বিনামূল্যের ডাল বা ছোলার উপর। কত শত সহস্র পরিবারের কাছে পরনের নতুন জামাকাপড় স্বপ্ন হয়ে গেছে, দু'তিনবার চা খাওয়াটা বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়েছে, বাড়িতে কেউ এলে সামান্য আতিথেয়তা না করতে পারার যন্ত্রণা ও অপমান কুরে কুরে খেয়েছে, সামাজিক মেলামেশা যাতায়াত কমিয়ে দিতে হয়েছে, সামান্য একটা স্মার্টফোনের অভাবে কত মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনায় ছেদ টানতে হয়েছে। যে মেধাবী বা পড়াশোনায় একটু ভালো ছেলেমেয়েরা ভাবছিল দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে শিক্ষাগত যোগ্যতায় স্বচ্ছলতার দিশা দেখানো চাকরি করবে, তাকে হয় ভিন্ন রাজ্যে যেতে হয়েছে মজুরির জন্য বা নিজ এলাকাতেই খুলতে হয়েছে সব্জি বা লটারি টিকিটের দোকান, বয়স না হতেই কিশোরী মেয়েটিকে পড়াশোনার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসা আর অনাকাঙ্খিত সন্তানের মা হতে হয়েছে। যাঁরা সরকারি চাকুরে বা নিশ্চিত আয়ের মানুষ, বড় ব্যবসায়ীদের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল—তাঁদের পক্ষে অনুভব করাও মুস্কিল প্রতিবেশী নিম্ন মধ্যবিত্ত, দরিদ্র পরিবারগুলি কয়েক মাসের মধ্যে জীবনযাপনের সামান্য আয়োজনটুকুকেও ন্যূনতম করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

অন্যদিকে ২০২০-র চেয়ে ২০২২-এ নিখোঁজ কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা বেড়েছে। এদের সিংহভাগই মেয়ে, ঐ সময় মধ্যপ্রদেশে নিখোঁজ হয়েছে শতকরা ২৬ ভাগ বেশি, রাজস্থানে ৪১ ভাগ বেশি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখছি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যে দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের এলাকায় চিকিৎসক হিসেবে পেশাগত কাজে নিযুক্ত, সেখানে ২০২০-র আচমকা লকডাউন তো বটেই, এখনো সামান্য কিছু ওষুধ বা পরীক্ষা বাইরে থেকে কেনার বা করার কথা বললে করুণ হেসে কতজন ঐ একই কথা বলছেন, 'কাম নাই'। মোটামুটি সেলাইয়ের কাজ থেকে কিছু উপার্জনশীল মানুষ এখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারেন নি। তবে হয়তো পারবেন একসময়। এ ছবি বিশ্বময়। কিন্তু ভয় হয় কর্পোরেট সংস্থা, ব্যবসায়ী মহল, কিছু রাজনৈতিক নেতা—এরা মিলে যে বিপুল অর্থ নিজেদের জঠরে প্রবেশ করিয়েছে, তার ঘাটতি এই ঘুরে দাঁড়ানোটাকে কতটা বিলম্বিত করবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি শুধু কোভিড আর করোনা নিয়ে মাত্রাছাড়া মাতামাতি, আতঙ্ক সৃষ্টি (আর ব্যবসা)। তার কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও, অতিমাত্রায় তার প্রচার জনমানসে যে ভয়, হতাশা, অমানবিকতার সৃষ্টি করেছিল তার রেশ থাকবে। এই মাত্রাটাই ছাড়িয়ে গিয়েছিল অতিমারীর সময়ে বা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সচেতনভাবেই। একই সঙ্গে অবহেলিত হয়েছে যক্ষ্মা, ডেঙ্গু, শিশুদের টিকাকরণ ইত্যাদি ধরনের স্বাস্থ্য প্রকল্পও। এর ছাপ পড়েছে সংশ্লিষ্ট রোগগুলির বৃদ্ধির মধ্যে। যেমন ২০১৯-এ বিশ্বে ১৩-১৫ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মায় মারা গেছেন। আক্রান্ত প্রায় ১ কোটি, এর শতকরা ৪১ ভাগই ভারতে। যক্ষ্মায় মৃত্যুহার শতকরা ১৪ ভাগ, কোভিড-১৯-এ বড়জোর ২-৪ ভাগ। ২০২০-২১ সালে যক্ষ্মায় মৃত্যু কয়েক লক্ষ বেড়ে গেছে। তার মূল কারণ এর উপর গুরুত্ব কমে যাওয়া। এ ছবি অন্যান্য প্রতিরোধযোগ্য ও নিরাময়যোগ্য কিছু রোগের ক্ষেত্রেও সত্যি।

অন্যদিকে কোভিড অতিমারী বাধ্য করেছিল নানা ধরনের ধর্মানুষ্ঠান ও প্রকাশ্য জ্যোতিষব্যবসার মতো সামাজিক ব্যাধিগুলিকে ধামাচাপা দিতে। বিশ্ববাসী দেখল মন্দির, মসজিদ, গির্জা তথা যাবতীয় প্রকাশ্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ মাসের পর মাস সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখলেও কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু এই দেখাটা যে শিক্ষায় পরিণত হয় নি, তা আমরা দেখছি অতিমারীর প্রকোপ কমতে না কমতেই। আবার রমরমিয়ে চলছে ধর্ম ব্যবসা, ঐশ্বরিক শক্তির কাছে মাথা খোঁড়া। অথচ অতিমারীর সময় একসময় চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা মানুষের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্রিয়াকলাপই মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল, কোনো ঈশ্বর, আল্লা, গড, বাবাজি, অবতার, স্বামীজী, ইমাম, যাজক নয়। এই শেষের দলবল অতিমারীর পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়া শুরু হতেই স্বমূর্তি ধারণ

করেছে। এটাও প্রমাণিত হল যে ভাবিজী পাঁপড় খেয়ে, থালা বাজিয়ে আর প্রদীপ জ্বালিয়ে করোনা তাড়ানো যায় না।

প্রায় দু'বছরের ঐ অভিজ্ঞতা, এই প্রজন্মের কেউই হয়তো ভবিষ্যতে পাবেন না। তার সার্বিক প্রভাব সমাজ অর্থনীতি সংস্কৃতি শিক্ষা মানসিকতা রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা ইত্যাদির উপর কতটা পড়েছে, এবং কতকাল তা থাকবে সেটি বিস্তারিত গবেষণার বিষয়। এ নিয়ে ভুরি ভুরি লেখাও হয়তো হবে। কিন্তু একে কাজে লাগিয়ে বা ঐ সময় যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিকল্পনাহীনভাবে শিক্ষার বিপর্যয় ঘটানো (কিছু ব্যতিক্রমী দেশ ছাড়া), অপরিণামদর্শীর মতো লকডাউন ঘোষণা, জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে অবহেলা, ঐশ্বরিক অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরতার ও ধর্মানুষ্ঠানের অসারত্ব ইত্যাদি থেকে শুরু করে শৈশব থেকে প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন নয়, সুস্থ প্রকৃতি ও তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বেড়ে ওঠা, বা ভিড়ের জায়গায় মাস্ক পরা, সবসময় হাত পরিষ্কার রাখা ইত্যাদির গুরুত্ব —এসব ব্যাপারে কি আমরা শিক্ষা নিয়েছি বা নেব? উমা

স্বচিকিৎসা —পর্ব ৮

তস্য পর্ব ঃ বার্ধক্য ৩

গৌতম মিস্ত্রী

কিছু শারীরিক কষ্ট একটু অন্য রকমের—অন্যরকম তার কারণ আর তার সমাধান। বেশ কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য হাজারো রকমের ট্যাবলেট, সিরাপ, ইনজেকশন, মলম, করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, স্টেন্ট ইত্যাদি আছে। সেই চিকিৎসায় রোগের উপশম বা মুক্তি ইত্যাদি মিললেও অন্য কিছু রোগের রোগলক্ষণ সর্বোত্তম চিকিৎসা সত্ত্বেও থেকে যায়। সেটা অবহেলার যোগ্য নয়। সেই রোগের নাম বার্ধক্য। যার সমাধানের জন্য এখনও কোনো ম্যাজিক ওষুধ আবিষ্কার করা যায় নি। সেই কষ্টের 'না-অসুখ' বা বার্ধক্য মানবশরীরের এক প্রাকৃতিক অমোঘ অন্তিম অবতার। তার নিরাময়ে কোনো ম্যাজিক ট্যাবলেট কাজে লাগে না। বার্ধক্য তো আর কোনো রোগ নয় বা বার্ধক্য হল অসুখের এক 'না-রোগ অবতার'— মৃত্যুর আগে এক অতি স্বাভাবিক ও পরিবেশ-বান্ধব (ইকো-ফ্রেন্ডলি) অবস্থা যার ওষুধ থাকতে নেই। কেমনে তার মোকাবিলা করা যায়? আসুন তার আলোচনায় কিছুটা সময় ব্যয় করি।

সমস্যা ঃ ২ —কোমরে ও হাঁটুতে বাতের ব্যথা অথবা মামুলি আঘাতে হাড় ভেঙে যাওয়া

দু'পেয়ে মানুষের শরীরের খাঁচার কথা ঃ আমাদের শরীরের অবয়ব ধরে রাখার জন্য —চামড়া, মাংসপেশি, চর্বি, রক্ত, রক্তরস (লিম্ফ্), হৃদপিণ্ড, যকৃৎ (লিভার), বৃক্ক (কিডনি) ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাতে সঠিক অবস্থানে থাকে, একে অপরের সাথে মাখামাখি হয়ে না যায়, তার জন্য অন্যান্য ধারকের মধ্যে অন্যতম শক্ত-পোক্ত অথচ প্রয়োজন অনুযায়ী চালনাযোগ্য একটা হাড়ের কাঠামো থাকে। যেমনটি মাটির প্রতিমার ভেতরে বাঁশ বা কাঠের কাঠামো থাকে। মাটির প্রতিমার ও প্রাণীর শরীরের হাড়ের কাঠামোর মধ্যে তফাৎ হল, প্রতিমার কাঠামোর হাত-পা স্থির, অথচ মানুষ সহ মেরুদণ্ডী প্রাণীর হাড়ের কাঠামোর হাত-পা চালানো যায়, মেরুদণ্ড বাঁকানো যায়, হাড়ের জয়েন্ট অর্থাৎ অস্থিসন্ধি বাঁকানো যায়। জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু অবধি শ্বাস নেওয়ায় জীবনভর সুষমভাবে চলতে থাকে বুকের খাঁচার হাড়গুলির হাপরের মতো কাজকারবার। আমরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও বুকের হাঁপর থামে না। বুকের খাঁচার আয়তনের বাড়া-কমার এই জৈবিক ক্রিয়া চলতে থাকে আমাদের অবচেতনে। হারমোনিয়ামের বেলোর মতো চলতে থাকে বুকের মধ্যেকার আয়তনের বাড়া ও কমার ফুসফুসের কাজ। ফলে বাতাস ফুসফুসে ঢুকতে ও বেরোতে পারে। তারই ফলে বাতাসের অক্সিজেন আত্মস্থ করে মানুষ সহ সহ অ-জলচর প্রাণীরা চলে ফিরে বেড়াতে পারি। অপর দিকে আমাদের বয়স বাড়লে প্রাকৃতিক নিয়মে গাঁটে গাঁটে ক্ষয়জনিত এক ধরনের অনিবার্য বাতের রোগ হয় যার পোশাকি নাম অস্টিওআরথ্রাইটিস। অঙ্কের নিয়মে বুড়ো-বুড়ি না হলেও হাঁটু, গোড়ালি, কোমর সহ মেরুদণ্ডের হাড় ও তার জয়েন্টের ক্ষয় অনেকের আগেই হয়, যেটাকে অকাল-বার্ধক্য বলা চলে। এটা হয় অস্থিসন্ধির ব্যবহারের অপ্রতুলতার জন্য। একই রোগ বুকের খাঁচার হাড়ের অস্থিসন্ধিতে হলে আমাদের শ্বাস নিতেও বুকে ব্যথা হয় কেবল বুকের খাঁচার অস্থিসন্ধির রোগে। মানুষের ভাগ্য (!) ভাল—না চাইলেও, অবচেতনে আমরা

সক্রিয় না হলেও আমাদের বুকের খাঁচার ব্যায়াম হতেই থাকে আমাদের অগোচরে। ফলে বার্ধক্যে অস্থি ও অস্থিসন্ধির ক্ষয়রোগ বুকের খাঁচাকে সাধারণত নিশানা করতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সমস্যা ছিল অন্য। মানুষের আয়ু সেইসময় একবিংশ শতাব্দীর মতো এত দীর্ঘ ছিল না। সেই অদীর্ঘ, অধুনা আবিষ্কৃত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা মানুষের অপরিবর্তিত আয়ুর জন্য সেই সময়ের লালন ফকিরের এই দর্শন-গীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল—'খাঁচার ভিতরে অচিন পাখি কেমনে আসে-যায়...।' এখন সমস্যা পাল্টে গেছে। এখন হাড়ের খাঁচা অক্ষম হয়ে গেলেও ভাঙা খাঁচার মধ্যে প্রাণপাখি ধুকপুক করতে থাকে আমাদের বার্ধক্যে। যতটা পারা যায়, আমাদের হাড়ের খাঁচাটিকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত শক্তপোক্ত রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে আধুনিক কালের আর্থসামাজিক আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশাল উন্নয়নের ফলস্বরূপ আমাদের আয়ু বেড়ে যাবার জন্য।

রোগ আর বার্ধক্যের মধ্যে একটা স্থূল পার্থক্য আছে। যদি হাড়ের খাঁচার সুস্থতার কথা ধরি, হাড়ের সংক্রমণজনিত সমস্যা (osteomyelitis) বা ক্যান্সার জাতীয় টিউমার (secondary metastasis, multiple myeloma, giant cell tumour) হল রোগ। অল্প বয়সের অস্থিসন্ধির প্রদাহজনিত সমস্যা হিসাবে রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস আর আঘাতজনিত সমস্যা হিসাবে হাঁটুর লিগামেন্ট (হাঁটুর উপরের ও নীচের হাড়গুলোকে যথাযথ জায়গায় ধরে রাখার একাধিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি) ছিঁড়ে যাওয়া হল রোগ। এই সব হাড় আর অস্থিসন্ধির রোগ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। এগুলো সর্বাত্মক নয়—সবাইকে আক্রান্ত করে না।

বার্ধক্যে হাড় আর অস্থিসন্ধির রোগের সমস্যা সংখ্যায় বেশি। অস্থি-সন্ধির ক্ষয় আর ভঙ্গুর হাড় বার্ধক্যের অমোঘ নিয়মে প্রায় সবাইকে অচল করে। অপঘাতে ও অকালে মৃত্যু হলেই একমাত্র বার্ধক্য এড়ানো সম্ভব। কিন্তু সেই পরিণতির কথা আলোচিত হলেও স্বেচ্ছায় সেটার প্রয়োগ করেন হাতে গোনা কিছু স্বচ্ছল দেশের ব্যতিক্রমী নাগরিক। স্বেচ্ছামৃত্যু আমাদের দেশে ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। বার্ধক্য থেকে নিস্তার নেই বলেই উন্নত দেশে ঘরদোর, রাস্তাঘাট, বাস-ট্রাম, শপিং মল আর বিনোদনের পার্ক হুইল চেয়ারে বসা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চলাচলের মতো করে তৈরি। ভবিষ্যতে হাড়ের খাঁচার বার্ধক্যজনিত ক্ষয় ঠেকানো গেলে হুইল চেয়ার মিউজিয়ামে জায়গা পাবে। এখন হাড়ের ও তার জয়েন্টের বার্ধক্য বাস্তব ও অমোঘ বলে কিছু রোগভোগের নিয়ন্ত্রণের কিছু কৌশল (সম্পূর্ণ এড়ানো অসম্ভব) জেনে নেওয়া যাক, যাতে বৃদ্ধ বয়সে আরও কিছুটা কাল হুইল চেয়ারে বন্দি জীবন মেনে নিতে না হয়।

আমাদের শরীর বুড়ো হলেও রাজা উজির থেকে দিনমজুরের মন কিন্তু তরুণ থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। যৌবন পেরোলেই শরীরের হাড়ের দুই ধরনের সমস্যা শুরু হয়। প্রথমত হাড়ের ক্যালসিয়াম কমতে থাকে, হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়, ঠুনকো আঘাতে বা আছাড় খেলে হাড় ভেঙে যায়। দ্বিতীয়ত দুই হাড়ের মধ্যেকার গাঁট বা অস্থিসন্ধি মরচে পড়া দরজার কব্জার মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। সাবলীলভাবে আমরা চলে-ফিরে বেড়াতে পারি না। হাঁটু কনকন করে (হাঁটুর অস্টিওআরথ্রাইটিস)। বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ালে কোমরে ব্যথা করে (মেরুদণ্ডের নীচের দিকের কশেরুকার (ভার্টিব্রার) ক্ষয় রোগ, (Lumbo-sacral spondylosis, slipped disc,এটাও এক ধরনের অস্থিসন্ধির ক্ষয় রোগ। এই দ্বিতীয় সমস্যার নাম চলতি কথায় গেঁটে বাত। চিকিৎসকরা বলেন অস্টিওআরথ্রাইটিস)।

পৃথিবীতে উদ্ভবকালে জীবজন্তুর গড় আয়ু বা পৃথিবীতে স্থায়িত্বকাল 'বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনে' প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটার কোনো প্রাকৃতিক কারণ না থাকাই সম্ভব। জানা যাচ্ছে, ইদানীংকালে ভারতবর্ষের মানুষেরও গড় আয়ু বা জন্মলগ্নে কতদিন বাঁচবেন, সেই সংখ্যাটা বেড়ে গেছে। যদিও এই গড় আয়ু উন্নত দেশের চেয়ে আমাদের দেশে কিঞ্চিৎ কম। দুর্ঘটনা, অপঘাত আর বিরলতম ক্ষেত্রে শিকারী প্রাণীর খাদ্যে (মানুষের ক্ষেত্রে এটার অভিমুখ এখন বিপরীতমুখী হয়েছে) পরিণত হবার কারণ বাদ দিয়েই বলা যাক। মানুষের হস্তক্ষেপে অন্যান্য প্রাণীর আয়ু যেমন কমে যেতে পারে (পশুপাখি শিকার) আবার অবস্থাভেদে বেড়েও যায় (উদাহরণ ঃ চিড়িয়াখানার পশুপাখির আয়ু বৃদ্ধি)। আধুনিক মানুষের উদ্ভবকালে (আনুমানিক দুই থেকে তিন লক্ষ বৎসর আগে) মানুষের আয়ু কত ছিল সঠিক তথ্য জানা নেই। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মের সময় সারা বিশ্বের গড়পড়তা মানুষের সম্ভাব্য আয়ু ছিল ২৮.৫ বৎসর থেকে ৩২ বৎসর, ১৯৫০ সালে সেটা বেড়ে হয় ৩১-৩২ বৎসর, আর ২০১৯-২০২০ সালে ৭২.৬-৭৩.২ বৎসর। (https://en.wikipedia.org/Life_expectancy)। ভারতবর্ষ

আয়ুবৃদ্ধির দৌড়ের খেলায় পদক না পেলেও, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে এখন সেটা ৬৯.৭ বৎসর হয়েছে। (https://timesofindia.indiatimes,com/india/indias-life-expectancy-inches-up-2-years-to-69-7/articleshow/92166901,cms)। ভারতবর্ষের কৃতিত্বে খুশি হলেও এটা মনে রাখতে হবে, কেবল টিকে থাকা নয়, বর্ধিত আয়ুর মানও একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, আমাদের দেশে যেটা ভয়ংকরভাবে অবহেলিত।

এই ক্রমবর্ধিত আয়ু অর্জন সম্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে তার নিজের মতো চলতে না দিয়ে, স্বার্থপরের মতো কেবল মানুষের অনুকূলে প্রকৃতিকে পরিবর্তনের চেষ্টায়। সেই চেষ্টায় কিছুটা হলেও মানুষ আপাতত সফল। পানীয় জল পরিস্রুত করে, খাবার গরম করে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু মেরে, চাষের ক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগ করে, রোগের সংক্রমণে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে, জন্মের পরে রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করে, খাদ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে, মারণ রোগে উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বুদ্ধিমান মানুষ স্বজাতির আয়ু বেশ অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান মানুষের আয়ু আরও বাড়বে। এতে বেশি সংখ্যায় মানুষ তার জীবৎকালের অনেকটা সময় বার্ধক্যে কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন ও ভবিষ্যতেও হবেন। সেই পরিবর্ধিত আয়ুর শেষের দিকে পেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, মাথায় টাক পড়ছে, ঘন কালো চুল পেকে যাচ্ছে, চামড়া ঝুলে পড়ছে, হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে, অস্থিসন্ধি অচল হয়ে পড়ছে। এককথায় পরিবর্ধিত আয়ুর মান কমে যাচ্ছে। কম উপভোগ্য হলেও কে আর স্বেচ্ছায় মরতে চায়!

মনে রাখতে হবে, জীবজগতের নিয়মেই আমাদের শরীরের খাঁচা অর্থাৎ হাড়ের কাঠামো ত্রিশ-চল্লিশ বছর বিনা সার্ভিসে কাজ চালানোর মতো করেই সৃষ্ট। কোনো ভিন্টেজ গাড়িকে গাড়ি নির্মাতা কোম্পানির বেঁধে দেওয়া সচল থাকার সময়কালের পরেও চলমান রাখার জন্য ভিন্টেজ-কার এর নিয়মানুগ বিশেষ সার্ভিসং-এর দরকার হয়। প্রকৃতির নির্ধারিত আয়ুর পরেও চলমান রাখার জন্য ভিন্টেজ কার-এর নিয়মানুগ সার্ভিসিং-এর মতো আমাদের শরীরেরও সার্ভিসিং দরকার। সেই সার্ভিসিং-এর নাম 'নিয়মিত শরীরচর্চা ও স্থানীয় ও বর্তমান খাদ্যরুচি বনাম লালসার পরিবর্তে বুদ্ধিমানের মতো স্বাস্থ্যসম্মত সচেতন খাদ্য নির্বাচন।' এযাবৎ চিকিৎসা ও পরিবেশ বিজ্ঞান এই শরীরচর্চা ও তৎসম্পর্কিত স্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে ততটা তৎপর হয় নি, যতটা শরীরের রোগের চিকিৎসায় (যেমন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ইত্যাদি চিকিৎসা প্রযুক্তি) পারদর্শিতা দেখিয়েছে। ভিন্টেজ গাড়ির ব্রেকডাউনের মেরামতের চেয়ে গাড়ি ব্রেকডাউন ছাড়া তরতরিয়ে চলা গাড়ির মালিকের পছন্দ। আমাদের দেহ-গাড়ি সচল রাখার জন্য বার্ধক্যে আমাদের কষ্টের চিকিৎসার চেয়ে শরীর ও মনের উপরে আধিপত্য ঠেকানো জরুরি হওয়া উচিত।

আমাদের শরীর সুস্থতার উপরে আমাদের কেবল আয়ুষ্কালই নির্ভর করে না। বয়স বাড়লে মানুষের সৃষ্টিশীল অস্তিত্বের কর্মকাণ্ড, সক্রিয় ও অমূল্য জীয়ৎকাল ও বিনোদনের আনন্দঘন অনুভবসহ বেঁচে থাকার মান আমাদের শারীরিক সুস্থতার উপরে অসহায়ভাবে নির্ভর করে। প্রাণে না মারলেও গেঁটে বাতের ব্যথা আর ঠুনকো আঘাতে ভেঙে যাওয়া হাড় আমাদের জীয়ৎকালের সায়াহ্নে আমাদের অর্ধমৃত করে রাখে। বৃদ্ধ শরীরের ভেতরকার বেশ কিছু অঙ্গ অন্য ধরনের অনিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে বিশাল অর্থমূল্যে তার কিছুটা সুরাহা সম্ভব হয়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, প্রাথমিক পর্যায়ের হৃদরোগ এই গোত্রের রোগ। ইদানিংকালে ভারতবর্ষে এই রোগের এখন বেশ বাড়বাড়ন্ত। গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে অপরিণত বয়সেও এমনতরো অঘটন আকছার ঘটছে আধুনিক বিলাসবহুল শ্রমবিমুখ জীবনশৈলী ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের জন্য।

তবুও চড়া অর্থমূল্যে এই রোগের সাথে সহবাস করা যায়, বর্তমান চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগে। এটা কঠোর বাস্তব, গেঁটে বাত আর ভঙ্গুর হাড়ের কোনো ম্যাজিকাল সমাধান আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনও দিতে পারছে না। বিকল্প হিসাবে হাঁটু বদলের অপারেশন, হুইল চেয়ার, অথবা অন্তিম ও দীর্ঘায়িত আমরণ শয্যায় আমাদের টিকে থাকা ছাড়া বিকল্প কিছু পড়ে থাকছে না। গেঁটে বাত আর ঠুনকো হাড়ের প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হাড় ঠুনকো হলেই ভেঙে যাবে সেটা যেমন নয়, আবার শক্তপোক্ত হাড়ও ভেঙে যেতে পারে বেকায়দায় আঘাত লাগলে। বেকায়দায় আঘাত না লাগার জন্য কিছু করা সম্ভব। আমরা ভুগছি একটা নতুন উপদ্রবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কেমন যেন হাঁটার সময় টাল খাচ্ছি, একসময়ে একদিকে বা অন্যসময়ে অন্যদিকে হেলে যাচ্ছি। আমরা জানি, দুপায়ে

খাড়া আধুনিক মানুষের উদ্ভবের কয়েক ধাপ আগেই চারপায়ে হাঁটা স্তন্যপায়ী জীব চারপায়ে হাঁটার পরিবর্তে দুপায়ে খাড়া হতে শিখেছিল। বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সায় পেলে মানুষ চারপায়ে চলাফেরা করলে হয়ত জীবনের সায়াহ্নে হাঁটুর ব্যথায় মানুষ কাতর হত না। কিন্তু মানুষের পূর্বপুরুষ চার পায়ে চলে-ফিরে বেড়ানোর বদলে দু'পায়ে চলার ক্ষমতা অর্জনে কিছু সুবিধা হয়েছিল বলেই প্রাকৃতিক নির্বাচনে আধুনিক 'হোমো সেপিয়েন্স' প্রজাতির মানুষ দু'পায়ে পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। **উমা**

পুরুলিয়ার অবিস্মরণীয় জলদিদি ঃ নিরুপমা অধিকারী

প্রকাশ দাস বিশ্বাস

ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় কত না সাধারণ মানুষ কত অসাধারণ কাজ করে চলেছে, অধিকাংশ মানুষই তার খোঁজ রাখে না। মিডিয়ার প্রসাদ নীতিহীন রাজনীতি বা নৈতিকতাহীন রাজনীতিবিদদের প্রতি যতটা বর্ষিত হয় তার ছিটেফোঁটাও বর্ষিত হয় না এইসব ব্যতিক্রমী মানুষদের প্রতি। ফলে তাঁদের কাজকর্মের খবর বিশাল অংশের মানুষদের অগোচরেই থেকে যায়। কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বহু দূরের কথা তাঁদের নামটাও সেভাবে সাধারণের কাছে পৌঁছায় না। মুষ্টিমেয় কিছু গুণগ্রাহী উপলব্ধি করেন তাঁদের কাজের গুরুত্ব। স্থানীয়, আঞ্চলিক স্তরের বাইরে পৌঁছায় না তাঁদের কাজকর্মের সৌরভ। এদেশের যত সাধারণ মানুষ সুন্দরলাল বহুগুণা বা মেধা পাটকরের নাম শুনেছেন তার সামান্য ভগ্নাংশও কি শুনেছেন অনুপম মিশ্র বা ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের নাম? তবে যাঁরা সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মনের আনন্দে কাজ করেন, তাঁরা নামের তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা নীরবে নিজের কাজটা করে যান। এমনই এক নীরব কর্মী পুরুলিয়ার জলযোদ্ধা নিরুপমা অধিকারী—পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে যিনি পরিচিত ছিলেন 'জলদিদি' নামে। এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ বহু দূরের কথা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কত জন তাঁর নাম শুনেছেন তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন আছে।

নিরুপমার জন্ম ১৯৬২, ২৫ ফেব্রুয়ারি। পিতার কর্মস্থল পুরুলিয়ার আদ্রায়। তাঁদের স্থায়ী নিবাস পুরুলিয়া জেলারই ডুলমি—নডিহায়। পিতা তিনকড়ি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, মাতা পুষ্প গৃহবধূ। পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে নিরুপমা দ্বিতীয়। পিতার বদলির চাকরির সুবাদে তাঁর মেয়েবেলা কেটেছে নানা জায়গায় বাবার বদলির সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে তাঁর স্কুল, বন্ধুবান্ধব। কলেজের পাঠ পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজে। সেখান থেকে স্নাতক হবার পর স্নাতকোত্তর পড়াশোনা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এম এ পাশ করার পর বি এড পড়েছেন। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন-এ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করেন। কমপিউটার প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন নিরুপমা।

পড়াশোনার পাট চুকিয়ে নিরুপমা যুক্ত হন সাংবাদিকতার কাজে। স্থানীয় পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি লিখেছেন কলকাতার কাগজেও। পুরুলিয়ার মুষ্টিমেয় কয়েকজন সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকের অন্যতম ছিলেন তিনি। সাংবাদিকতার সূত্রেই ঘুরেছেন পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে। দেখেছেন সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। লক্ষ্য করেছেন সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের বারমাস্যা। সাংবাদিকের চোখ দিয়ে সেসব দেখতে দেখতেই বোধহয় তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যত কর্মপন্থা। পুরুলিয়া জেলার জলসংকট ও তার সম্ভাব্য এবং সহজ সমাধান নিয়ে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের সূচনা হয় তাঁর সাংবাদিকতার সূত্র ধরেই। নিরুপমা নিজেই লিখেছেন 'বিশেষ কারো উপকার করব বলে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম, এমন নয়। উপকার মূল্য অনেক। দেবার সামর্থ নেই। যাই হোক সমাজে বাস করি কিছুটা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, কিছুটা অন্তরের তাগিদ, কিছুটা ভয় মেশানো জলের নেশা মিলিয়ে এই আন্দোলনে যোগদান'।

২০০১-এ সাংবাদিকতার কাজে পুরুলিয়ার এক অখ্যাত গ্রাম ডাকাকেন্দু গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। সদ্য ফসল ওঠার পর (ফেব্রুয়ারি মাসে) সেই গ্রামে গিয়ে দেখেন গ্রাম জনহীন। অথর্ব আর কায়িক শ্রমে অক্ষম বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ছাড়া আর সবাই গ্রাম ছেড়ে গেছেন কাজের সন্ধানে। পুরুলিয়ার লোকজন ঐতিহ্যগতভাবেই বছরে দুবার চাষের কাজে বর্ধমান যান। একবার আমন ধান কাটার মরসুমে আর একবার বোরো ধান কাটার মরসুমে। আমন ধান কাটার পর পৌষসংক্রান্তির আগেই তাঁরা ঘরে ফেরেন। কেননা পুরুলিয়ার সবচেয়ে বড় লোকউৎসব টুসুর সময় পারতপক্ষে কেউই বাড়ির বাইরে থাকেন না। আপামর পুরুলিয়াবাসী মেতে ওঠেন টুসু উৎসবে। সেবার টুসুর সময়ও কেউ বাড়ি ফেরেন নি। ঘরে খাবার নেই উৎসব হবে কি করে!

নিরুপমা অবাক হয়ে দেখেন পাশের গ্রাম বিজয়ডিতে অন্য ছবি। সেখানকার মানুষ দুর্দশায় পড়লেও সে দুর্দশা ডাকাকেন্দুর মতো নয়। পাশাপাশি দুটি গ্রামের তুলনা করতে গিয়ে সাংবাদিক নিরুপমার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে দুটি গ্রামের অর্থনৈতিক বৈষম্যের পিছনে রয়েছে বিজয়ডি গ্রামের একটা বড় পুকুর। নিরুপমা উপলব্ধি করেন চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও বিজয়ডির আপাত স্বাচ্ছন্দের পিছনে বড়ো ভূমিকা রয়েছে বহুদিনের পুরোনো সেই পুকুরের। পুরুলিয়া শহরে ফিরে এসে নিরুপমা তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেন পুরুলিয়ার বিশিষ্ট মানুষ এবং তাঁদের পারিবারিক বন্ধু শ্যাম অবিনাশকে। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী প্রচারবিমুখ শ্যাম অবিনাশ আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। তিনি নিরুপমার হাতে তুলে দেন অনুপম মিশ্রের বিখ্যাত বই 'আজ ভি খরে হ্যায় তালাব'। হিন্দি তালাব শব্দের অর্থ পুকুর। বইটি পড়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় নিরুপমার। যুগ যুগ ধরে পুকুর কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে মানব সভ্যতাকে তার বিবরণ পড়ে তিনি উপলব্ধি করেন এ বই আনতে হবে বাঙালি পাঠকদের নাগালের মধ্যে। তার জন্য চাই বইটির সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। তিনি বইটি অনুবাদের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন অনুপম মিশ্রকে। সানন্দ সম্মতি এল অনুবাদের। কোমর বেঁধে অনুবাদের কাজে লেগে পড়লেন নিরুপমা। ২০০২ সালের মে মাসে 'আজও পুকুর আমাদের' নামে বের হল সেই অনুবাদ। শুধু বই অনুবাদ করেই দায় শেষ করেন নি তিনি। বুঝতে চাইলেন পুরুলিয়ার জল সমস্যার উৎস কোথায় আর তা থেকে পরিত্রাণেরই বা উপায় কি! শুরু হল এক অন্য অন্বেষণ। রুখা সুখা পুরুলিয়ার জল সংকট রোধে জলের অপচয় রোধ আর জল সংরক্ষণ নিয়ে শুরু হল এক অন্য আন্দোলন। নিরুপমার কথায় 'বর্তমান জল সমস্যার সমাধানে পুকুরের গুরুত্ব উপলব্ধি কজনের। যদিও এখন পুকুর বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে এই দৃশ্য সুলভ, পুকুর খোঁড়া হচ্ছে এই দৃশ্যের তুলনায়। অথচ ভারতে হাজার হাজার বছর এই পুকুরই সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে বৃষ্টির জল ধরে রেখে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরও বজায় রেখেছিল পুকুর-ই। এই ব্যবস্থা ছিল সমাজসিদ্ধ ও স্বয়ংসিদ্ধ'।

পুরুলিয়া বললেই যে কম বৃষ্টিপাতের গল্প শোনা যায় নিরুপমা সেই গল্পের গোড়া ধরেই টান দিলেন। নিরুপমা স্পষ্ট করে বললেন পুরুলিয়ার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৩২-১৩৫ সেন্টিমিটার। ভারতবর্ষের অর্ধেক এলাকায় যা বৃষ্টিপাত হয় তার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃষ্টি হয় পুরুলিয়ায়। ইতিহাস থেকে তুলে আনলেন ১৩০৫, ১৩৫৩, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে পুরুলিয়ার ভয়াবহ বন্যার কথা। প্রশ্ন রাখলেন পর্যাপ্ত বৃষ্টিই যদি না হয় তবে বন্যা হল কিভাবে? উত্তরটাও নিজেই দিলেন। পুরুলিয়ায় যে বৃষ্টিপাত হয় তা পর্যাপ্ত হলেও তার প্রায় সবটাই নদী বেয়ে চলে যায় নিম্নভূমিতে। পুরুলিয়ার ভূস্তর এমনই যে তা জল ধরে রাখতে পারে না। ফলে ভূগর্ভস্থ জলের টানাটানি চলতেই থাকে। অভিজ্ঞতা থেকেই একথা জানতেন পুরুলিয়ার মানুষেরা। তাই তারা ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর না করে নির্ভর করতেন ভূপৃষ্ঠস্থ জলের উপর। সারা বছরের জলের চাহিদা মেটাতে কাটানো হয়েছিল অজস্র পুকুর। সারা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা জোড়গুলো জল যুগিয়ে সামাল দিত খরার সময়কালীন জলের সমস্যা। সেকালের মানুষেরা দীঘি কাটানো পুণ্যের কাজ বিবেচনা করতেন। রাজা জমিদারেরা তো বটেই, এমনকি সাধারণ মানুষেরাও নিজেদের সাধ্যমতো দীঘি কাটাতেন। ঔপনিবেশিক সময়কালে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল এই পরম্পরাগত অভ্যাস। পুরুলিয়ার মানুষরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে মজে যেতে থাকল পুকুর, জলাশয়, জোড়, বাঁধগুলি। বৃক্ষহীন প্লাবনভূমি থেকে ক্ষয়ে আসা মাটি ভরাট করে তুলতে থাকল নদীতল। প্রয়োজনীয় দেখভালের অভাবে শুকিয়ে যেতে থাকল গ্রামীণ পুরুলিয়ার প্রাণস্বরূপা জোড়গুলি। পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে যেতেই জাঁকিয়ে বসল জলকষ্ট। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘায়িত হতে থাকল জলকষ্টের সময়কাল।

'পুরুলিয়া ঃ জলের ঐতিহ্য' (লোক, বইমেলা ২০০৩, বাংলার দীঘি জলাশয় সংখ্যা) প্রবন্ধে এই ভুলে যাওয়া পরম্পরাগত জ্ঞানের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নিরুপমা। রাজস্থানের জয়সলমীরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬-১৮ সেন্টিমিটার। সেই জলই পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করে যদি তারা তাদের সারা বছর জলের চাহিদা মেটাতে পারে তবে বার্ষিক ১৩২-১৩৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের পুরুলিয়া কেন জলকষ্টে ভুগবে সেই প্রশ্নটাই সামনে নিয়ে আসেন নিরুপমা। শুধু পুরুলিয়ার গ্রামই সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা নয় চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিরুপমা ছুটে গেছেন রাজস্থানে। 'তরুণ ভারত সংঘ'-এর অতিথি হয়ে ঘুরে দেখেছেন রাজস্থানের জল সংরক্ষণের পরম্পরাগত কৌশল। রাজস্থানের গ্রামে গ্রামে ঐতিহ্যবাহী জল সংরক্ষণাগার 'কুণ্ড' ও তার ব্যবহার দেখে তিনি এতই অনুপ্রাণিত হন যে পুরুলিয়ায় ফিরেই তিনি অনুবাদ করেন অনুপম মিশ্রের আরেকটি বিখ্যাত বড় বই 'কুণ্ড, রীতে ঘট ভর্‌নে কী রীত'। 'কুণ্ড ঐতিহ্যময় জলের ঐতিহ্য' নামে প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। রাজস্থান ভ্রমণকালেই কুণ্ড তৈরি ও তার ব্যবহার দেখে তিনি সঙ্ঘশক্তির ক্ষমতা নতুন করে উপলব্ধি করেন। বইটির ভূমিকায় তাই তিনি লেখেন, 'আমরা কেটেছেঁটে আজ 'আমি'তে স্থির। সর্বত্র আজ এই আমি-র প্রাধান্য। জলসমস্যায় এই আমি আমাদের কোন্ সংকটময় পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই জলসমস্যার সমাধান আমি দিয়ে কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। 'আমি'কেই 'আমাদের' পথ দেখায় এই ঐতিহ্যময় জলের ঐতিহ্য'। ইতিমধ্যে পারিবারিক উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন প্রকাশনী সংস্থা 'আশাবরী'। সেই প্রকাশনা থেকে বের হতে থাকে পরিবেশ বিষয়ক নানা বইপত্র। একদিকে নিজে যেমন অনুবাদ করেছেন অন্যদিকে তেমনি অন্যদের দিয়ে অনুবাদ করিয়েছেন, লিখিয়েছেন প্রয়োজনীয় বই। প্রকাশ করেছেন আশাবরী থেকে।

অন্যদিকে পুরুলিয়ার গ্রামে গঞ্জেও চলছিল জল সচেতনতা গড়ার কাজ। পুরুলিয়া শহরের প্রাণস্বরূপা সাহেব বাঁধ যখন প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিপন্ন, একদা নির্মল জলদাত্রী বাঁধের জল যখন পঙ্কিল, পুতিগন্ধময় তখন সাহেব বাঁধের সংস্কার নিয়ে জনমত গড়ে তোলেন নিরুপমা ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। অজস্র সভাসমিতি মিছিল পদযাত্রায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় সাহেব বাঁধ সংস্কারে। ফিরে আসে সাহেব বাঁধের হারানো ঐতিহ্য।

সিঁদুরপুর, জাহাজপুর, রামকৃষ্ণপুরের মতো পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরুপমা গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন গ্রামের পুকুরগুলির সংস্কারে। সঙ্গে পেয়েছেন একদল সমমনস্ক লোককে। সবসময় গ্রামের লোকদের বোঝানোর কাজটাও সহজ ছিল না। তবে নাছোড় মনোভাবে জয় করেছেন সমস্ত প্রতিকূলতাকে। গ্রামে গ্রামে ঘোরা পাশাপাশি 'কট দেম ইয়ং' অণ্ডবাক্য মেনে পৌঁছে গেছেন স্কুলে স্কুলে। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাদের বুঝিয়েছেন জল সংরক্ষণের গুরুত্ব। জলের অপচয় রোধ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের। পি এইচ ই ইঞ্জিনিয়ারদের একাধিক সভায় তিনি তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন, তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন জল সংরক্ষণের পরম্পরাগত কৌশল, যাতে তারাও হয়ে উঠতে পারেন এক একজন জলযোদ্ধা।

রাজস্থানের 'সম্ভব' সামাজিক সংগঠনের আহ্বানে ২০১১ সালে আবার রাজস্থানে যান নিরুপমা। সেখানে দেখেন কি একাগ্রতার সঙ্গে প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটাকে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টির ফোঁটা তো নয় যেন রজতবিন্দু। ২০০৩-এ ভারতীয় ভাষা পরিষদ তাঁকে দিয়ে অনুপম মিশ্রের 'রাজস্থান কি রজতবিন্দু' বইটি অনুবাদ করিয়েছিল। পরে ২০০৭-এ আশাবরী থেকে বের হয় বইটি। পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে সভাসমিতিতে তিনি তাঁর রাজস্থানে দেখে আসা অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেন। যৌথ উদ্যোগে কিভাবে একটা গ্রাম বদলে দিতে পারে তার জন্য টেনে আনতেন লাপোডিয়ার দৃষ্টান্ত। খরাক্লিষ্ট একটি গ্রাম, যে গ্রাম থেকে বাঁচার জন্য মানুষ পালিয়ে যেত ৮০ কিমি দূরের জয়পুর শহরে। শহরে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করে স্বপ্নেও ভাবত না গ্রামে ফেরার কথা সেই গ্রাম কিভাবে ঘুরে দাঁড়ল যৌথ উদ্যোগে, সেই কথাই ফলাও করে বলতেন নিরুপমা। জনৈক লক্ষণ সিংহের নেতৃত্বে গ্রাম বিকাশ নবযুবক মণ্ডল কিভাবে প্রাণ ফেরাল মৃত গ্রামে, সে কাহিনী অনুপ্রাণিত করার মতোই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গোচারণভূমিতে প্রাণ ফিরিয়ে লাপোডিয়া হয়ে ওঠে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর। ২০০ পরিবারের ছোট গ্রাম লাপোডিয়া গ্রামের চাহিদা মেটানোর পরও জয়পুর ডেয়ারিকে যদি প্রতিদিন ১৬০০ লিটার দুধ বেচতে পারে তবে পুরুলিয়াই বা তা পারবে না কেন সেই প্রশ্নটা উস্কে দিতেন নিরুপমা। অনুপম মিশ্রের 'গোচর কা প্রসাদ বনতা লাপোডিয়া'-র বাংলা অনুবাদও করেন নিরুপমা। 'লাপোডিয়া একটি দৃষ্টান্ত' নামে সেই পুস্তিকা আশাবরী থেকে প্রকাশিত হয় ২০০৮-এ।

পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী অযোধ্যা পাহাড়কে বাঁচানোর অন্দোলনেও সামিল হয়েছিলেন নিরুপমা। হুটমুরার হরিমতী বালিকা বিদ্যালয়ের জলসমস্যার সমাধানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সকে সঙ্গে নিয়ে একটি রূপায়নযোগ্য প্রকল্প তৈরি করেছিলেন নিরুপমা। গ্রীন স্কুল প্রজেক্টে পুরুলিয়ার ছোট্ট স্কুল রামকৃষ্ণপুরের বিজয়ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি চমৎকার প্রকল্প রচনা করে অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলেন ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফান্ড ইউনিসেফকে। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে অজস্র সভা সেমিনারে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলছিল সাংবাদিকতা, লেখালেখি ও প্রকাশনার কাজ। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর অনুদিত আর একটি বই 'যেও না তুমি পরদেশ'। এটিও অনুপম মিশ্রের বিখ্যাত বই 'না যা স্বামী পরদেশা' বইটির অনুবাদ। 'বিদ্যালয়' নামের এক পত্রিকায় লিখেছেন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। আশাবরী ও পরশমণি সংস্থাদ্বয়ের মাধ্যমে নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজেও অংশ নিতেন সক্রিয়ভাবে। বহু দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে অর্থসাহায্য করে তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেছেন তিনি। বীরহোড় জনজাতি নিয়েও কিছু গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন তিনি। এতসব সামাজিক কাজের চাপে সময় পাননি সংসার পাতার। সামাজিক কাজকেই সাংসারিক কাজ বিবেচনা করে আজীবন সেই দায় পালন করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর সমাজ হিতৈষণার স্বীকৃতিতে ২০০৩-এ আলোয়ার রাজস্থান থেকে পেয়েছিলেন পর্যাবরণ প্রেমী পুরস্কার, ২০০৫-এ পান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর হিউম্যান ভ্যালু সংস্থার এনভায়রনমেন্ট পুরস্কার।

২০২১-এর ২৮ মার্চ দুঃসহ করোনাকালে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মাত্র ৫৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন পুরুলিয়ার অবিস্মরণীয় জলযোদ্ধা নিরুপমা। তাঁর মৃত্যুর পর জি এন মুখার্জী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট তাঁকে মরণোত্তর জি এন মুখার্জী স্মারক সম্মানে ভূষিত করে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা — সঞ্জয় অধিকারী। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

উমা

জল, জলাশয় : জলজীবনের সাতকাহন

অরিত্রী দে

জলের কথা : জল আর জলাশয়ের ইতিহাস লালন করে মানুষেরই কথকতা। আমাদের দেশে যে লক্ষ লক্ষ দীঘি-পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় ছিল, সেগুলো টিকে থেকেছে পাঁচশো-সাতশো বছর ধরে। অথচ এখনকার যে জলাশয় পরিচালন ব্যবস্থা, তাতে কিছুদিন পরপরই সংস্কার করার দরকার পড়ে। এর পেছনে যে মানব সংস্কৃতির ইতিহাস, তার কথা না বললেই নয়। ছোটবেলায় মা-ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি যে একসময় রাজা-রাজড়া ও জমিদারেরা পুণ্যার্জনের আশায় পুকুর কাটত, গাছ লাগাত। গ্রামেগঞ্জে বিশেষ বিশেষ তিথিতে রীতিমতো উৎসব করে জলাশয় খনন চলত। এজন্য স্বতন্ত্র এক জীবিকারও জন্ম হয়েছিল — 'গজধর'। যারা জলাশয়, কুয়ো কাটত আর সহজে বলতে পারত ভূমির কোন দিকে কতটা ঢাল, তারই 'গজধর' নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে তারা প্রকৃতিকে ভালোবেসেছে, জেনেছে মরা জল কি, পচা জল কাকে বলে ও তা তৈরি হওয়ার কারণ কি। আসলে সারা বছরের জলের প্রয়োজন মেটাতে যে পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়গুলো তৈরি করা হত, তার একটা টেঁকসই নির্মাণ শৈলী আছে। নির্মাণের লোকপ্রযুক্তিকে পাত্তা না দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে যখন পুকুর বা কুয়ো সংস্কার করা হয় তখন সে কাজ ঠুনকোই হয়। পরিকল্পনাহীন খোঁড়ার ফলে জলাশয়ের দুর্বল পাড় ভেঙে পড়ে, সাফ হওয়া মাটি দ্রুত নেমে আসে, কংক্রিটে বাঁধানোর ফলে মাটির সঙ্গে জলের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে বিঘ্নিত হয় জলের PH value, মিষ্টতা। আগে গ্রাম ও বিভিন্ন এলাকা জলাশয়ের নামে পরিচিত হত। যেমন — পুকুর অর্থে 'Sar' (সর), রাজস্থান সহ অন্যত্র আজও বেশ কিছু জায়গার নামের পরে অনুসর্গ হিসেবে 'Sar' ব্যবহৃত হয়, যেমন Amritsar, Patisar ইত্যাদি। আগে গ্রামগুলিতে দেশি উপায়ে জল সংরক্ষণ করা হত। রুক্ষ-শুষ্ক কালের জন্য Rain water harvesting তথা বৃষ্টির জল ধরে রাখার প্রণালী তার মধ্যে অন্যতম। পাহাড়ি এলাকার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে আসা জল, খাওয়া আর সেচের জন্য বেঁধে রাখা হত 'জোহড়-জোহড়ি'র (দেশীয় বাঁধ) মাধ্যমে। তাতে জল সছিদ্র মাটি দিয়ে ভূগর্ভে গিয়ে জলস্তর বাড়াত, বহু শুকনো নদীও টলটলে জলে ভরে

উঠত, এমনকি তা দিয়ে প্রবল গ্রীষ্মেও 'জল রিচার্জ' করা সম্ভব হত। এছাড়াও আশেপাশের ভেজা মাটিতে গাছ, ফসল জন্মাতো। রাজস্থান, আলোয়ার, পুরুলিয়ার ঝালদায় এখনও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। আরাবল্লি থেকে যে সতেরোটি জলধারা নামত যমুনায়, তারা দিল্লির নিচের মাটি জলে এমন ভিজিয়ে রাখত যে প্রায় প্রত্যেক নাগরিকের উঠোনের কুয়ো খুঁড়লেই জল উঠত। যমুনার জল শহরের নিত্যকাজে ব্যবহার হত প্রথম মুঘল আমলে। নদী থেকে জল শহরের সমতলে আনতে যে চ্যানেল কাটা হত, তা শহরবাসীদের বসতের মধ্য দিয়ে বাদশাহের ঘরে যেত। ফলে জল সাফ সুতরো রাখার দায়িত্ব সকলের ছিল, জল বিষয়ের নীতিবোধ সকলে মানত। বলাই বাহুল্য একসময়ে জলের আকাল সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতেই ছিল। 'জল-সংস্কৃতি' আর তাকে ঘিরে হাজারো জলসংস্কার, জলসাধনের বৈচিত্র্য ছিল। তিথি পুজো শ্মশানযাত্রা এমনকি অশৌচমুক্তি ইত্যাদি আচার জল নিয়েই আজও অনুষ্ঠিত হয়। দুই নদীর মিলনস্থল যজ্ঞের প্রকৃষ্টতম পুণ্যস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়, ফলে আমাদের তীর্থযাত্রা মানেই কোনো না কোনো নদী বা পুকুর ঘাট।

জল বিষয়ে পরনির্ভরতা : কোনো এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি বলতে বাজরি পুঁজির বিনিময় মূল্যে সেখানকার জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধিকেই কেবল বোঝায় না— এলাকার স্বনির্ভরতাকেও বোঝায় যা সেখানকার অর্থনীতিক ক্ষেত্রের প্রসারকে চিহ্নিত করে। এক্ষেত্রে জলকেন্দ্রিক স্বনির্ভরতা কৃষি, মৎস্যচাষের প্রাচুর্যে সেই পরিসর তৈরি করে। পাশাপাশি স্বনির্ভরতা ও স্বচ্ছলতা আসে পশুপালন আর অন্যান্য সহযোগী জীবিকায়। মোটামুটিভাবে উনিশ শতক পর্যন্ত জলাশয় নির্মাণ চলেছিল। ১৮৫০ সালে পুঁজিতন্ত্র সমাজের প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়, বিশ্বায়নের আধুনিক পর্ব শুরু হয়। সবকিছু মুনাফায় মাপা হতে থাকে, মানুষ Land agent হয়ে উঠল, জলাশয় বিক্রি হতে থাকল, সেগুলি বুজিয়ে বহুতল নির্মাণ হল আর জল-জলাশয়ের অভাব পৃথিবীর সবচেয়ে তীব্র সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সর্বত্র তাই চেষ্টা চলছে বিকল্প জলব্যবস্থা খুঁজে বের করার। যেন শস্যদানার চেয়ে অনেক বেশি দামে পানীয় জল কেনার কালে পৌঁছতে না হয়, তার জন্য সকলকে সতর্ক হতে হবে। এখনই শুদ্ধ পানীয় জল আমাদের কিনে খেতে হচ্ছে, এই একবিংশ শতকে বোতলবন্দি জল বিক্রির পরিমাণ প্রায় ৯০.৭ লক্ষ গ্যালন। এই পরিমাণ জল কিনতে বাজারি মূল্য দিতে হচ্ছে জনগণকে আর সেটা পাচ্ছে বহুজাতিক জলব্যবসায়ী সংস্থা। দিল্লি-বম্বে-চেন্নাই-বেঙ্গালুরুর মতো নগরী, মাঝারি বহু শহর পানীয় জলের জন্য কোনো না কোনো কোম্পানির প্যাকেজের ওপর নির্ভর করে। জীবনধারণের মূল যে জল, তার জন্য এই পরনির্ভরতা আমাদের চমকে দেয়। প্লাস্টিকের বোতল পানীয় জল রাখার পক্ষে আদর্শ নয়। সূর্যতাপ প্লাস্টিকের পাত্রের সঙ্গে জলের ক্ষতিকারক বিক্রিয়া ঘটায়। এই প্লাস্টিক বোতলের রাশ জলাশয়ে জমে উঠছে, ফলে জলের অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে। অক্সিজেন ডিমান্ড বলতে বোঝায় জলে অক্সিজেন মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়া, এতে বর্জ্য দূষিত জল অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জীবাণুকে অপচিত করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে না। জলজ প্রাণীও বাঁচে না, জল ক্রমে মজে যায়। উষ্ণতায় আর বাতাসের ধাক্কায় প্লাস্টিক গুঁড়ো হয়ে, সেখান থেকে খাদ্যচক্রে ঢুকছে। দেখা যাচ্ছে জল, জলাশয়ের কথা বলতে বলতে প্লাস্টিকের কথায় চলে এলাম, আসলে সবটাই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। জলঙ্গির বুক প্লাস্টিক আর কচুরিপানায় ভর্তি, তার বিখ্যাত চিংড়ির সম্পদ আর নেই। নদীয়ায় ঈশ্বর গুপ্ত সেতুর তলায় বহমান গঙ্গার বুকে এমন চর জেগে উঠেছে যে দেখলে ডাঙ্গা এলাকাই মনে হয়।

শহর আর তার জলজীবন : প্রবল বর্ষায় শহরে, গ্রামে ভাসাপানি বা বন্যা প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। এই সাধারণ সমস্যা মেটানোর মতো প্রযুক্তি আমাদের নেই। জল নিচু

তলের দিকে গড়িয়ে যায়, মাটি আর পাথরের ক্ষয় কোনো নিচু খাত ধরে বইয়ে নিয়ে গিয়ে নিচু জায়গাকে ভরাট করে। উঁচু-নিচুর ভেদ ঘুচিয়ে সমস্তটা সমান করে দেওয়ার কাজ সে কখনও বন্ধ করে না এবং খাতগুলোকে আরো গভীর করে। পরে আবার বানভাসির সময়ে ঐ মাটি, মাছ, জঙ্গলের পচা পাতার সার কুড়িয়ে নিয়ে জল গোটা এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। তাতে জমি উর্বরতা ফিরে পেত, জলাশয় মাছে ভরে যেত। শৈশবে আমরা দেখতাম এলাকায় জল উঠলে আবার ম্যাজিকের মতো জল নেমে যেত, তার মূলে এই প্রাকৃতিক প্রযুক্তিটি ক্রিয়াশীল ছিল। ফলে আগে বন্যার জন্য মানুষ তৈরি থাকত। এখন শহরায়নকে দ্রুত করতে গিয়ে সেই খাতগুলো মুছে গেছে, জলধারার গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, জোড়-কাঁদর-ছোটনদী নিচু খাতে নেমে গিয়ে আর 'হয়ে ওঠা'র জায়গা পাচ্ছে না। ভৌগোলিক কারণে যে এলাকাগুলো কড়াই কিংবা গামলার মতো, সেখানে একবার বর্জ্য ঢুকলে আর বেরনোর জায়গা পায় না। যেখান দিয়ে জল বয়ে যাওয়ার রাস্তা, সেখানে বসতি হওয়ার ফলে অবরুদ্ধ হচ্ছে জলের গতিপথ। ফলে দুর্গন্ধ, দূষণ আর রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে ঘনঘন। অথচ জলের ঢোকা-বেরনোর ব্যাপারে সমস্ত বিল, কাঁদর, খাল, খাতের মধ্যে রক্তসংবহনতন্ত্রের মতো কর্মপন্থা কায়েম ছিল। আমাদের রাজধানী শহরের বর্জ্য জল জমা হওয়ার জায়গা পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সল্ট লেক। সেখানে জীবাণুভর্তি জল প্রাকৃতিকভাবে জলজ বাস্তুতন্ত্রে শৈবাল ও মাছের খাদ্যে পরিণত হয়। সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি ও সালোকসংশ্লেষের প্রভাবে পুরো জল পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। সে কারণে টাকা খরচ করে বর্জ্য জল নিষ্কাশনের জন্য কোনো প্ল্যান্ট তৈরি করতে হয় নি কলকাতায়। উপরন্তু সেই জল ব্যবহার করে সবজি আর মাছ চাষ হয়, যা অর্থনীতিকে পুষ্ট করে। পরিবেশবিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের চেষ্টায় এই জলাভূমি এলাকা ১৯৯২ সালে সংরক্ষিত হয় এবং ২০০২ সালে 'রামসর সাইট' হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়। আজ জলাভূমি ভরাটের জেরে, প্রোমোটার কর্তৃক দখলদারিতে বড় বড় শপিং কমপ্লেক্স তৈরির জন্য নুনের ভেড়ি এলাকার বেশিরভাগটাই ভরে গেছে। ফলে প্রাকৃতিক নিকাশী ব্যবস্থাগুলো নেই। বদলে গজিয়ে গেছে ড্রেন ব্যবস্থা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠি দাঁড়িয়ে গেছে এই যে ঘরের তরল বর্জ্য বের করে দিতে পারলেই চলবে। প্লাস্টিক থেকে শুরু করে প্রকৃতিতে মিশে যেতে পারে না এরকম দ্রব্যের উচ্ছিষ্ট ফেলা হতে থাকল ড্রেনে। বন্যা হলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। আমরা দোষ দিতে থাকি সরকারকে, পঞ্চায়েতকে, ডিভিসিকে। বলতে বাধা থাকে না — প্রজন্মলব্ধ দেশীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জল ধরে রাখার কৌশল, এমনকি আমাদের শহরে-গ্রামে থাকা প্রাকৃতিক ডায়ালিসিস পদ্ধতি এখন উধাও। এক কথায় আমাদের জলজীবন বিপর্যস্ত, জলব্যবস্থা অনেক বেশি করে এই পরিবেশ বিপন্নতার কালে ভাবাচ্ছে। জলহীনতায় কৃষিহীন পৃথিবী দেখার আগে আমাদের যথাসাধ্য সতর্ক হতে হবে — ক) জলাশয়ের জল নিয়ে যে ভাগ-বাটোয়ারা চলছে, সিন্ধুনদের গতিপথ পরিবর্তন করে দেওয়া কথা উঠে এসেছে স্রেফ জাতিগত ও দেশগত বিভাজনের কারণে, তা অবিলম্বে সভ্যতার সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে বন্ধ করতে হবে। জল আর তার প্রাণসম্পদের সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু আন্দোলন হয়েছে। যেমন জল স্বরাজ আন্দোলনে (১৯৮০) রাজিন্দর সিং ও তাঁর সহযোগীরা রাজস্থানের আলোয়ারে মাটি, পাথর দিয়ে তৈরি ছোট ছোট জলাধারে জল ধরে রাখেন রুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়ায়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হাতে আছে বলে কোনো বাধাই মানব না, যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত টেনে নিতে হবে হাতের মুঠোয়— মূলত এই পুঁজিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধেই জলের মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে সাতের দশকে একাধিক আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৯০-তে ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম চিল্কা বাঁচাও আন্দোলনও করেছিল। জলের এই আন্দোলনগুলোর পেছনে রয়েছে আসলে কর্পোরেটাইজেশনের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার জনগণের অধিকার রক্ষার লড়াই। অবশ্যই মনে রাখতে হবে 'ব্যবহার' ও 'ভোগে'র মধ্যেকার সূক্ষ্ম বিভাজনটি। খ) কলকাতা বেশ নিচু এলাকা, নিচুতে জলের গতি কম হয়, পলি জমে। সেজন্য তার নিষ্কাশন প্রণালীগুলি ক্রমে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই নিয়মিত পলি ও বর্জ্য জল নিষ্কাশন করার পরিকল্পনা সরকারি স্তরে জরুরি। গ) নদীবক্ষে বেআইনি বালি তোলা বন্ধ করতে হবে। ঘ) জলাশয়ের বাঁধগুলির নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন। ঙ) কলকাতার জলাভূমি যাতে ব্ল্যাক লিস্টেড না হয়ে যায় তার জন্য বাণিজ্যিক আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতের রামসর সাইটে চিল্কা, লোকটাক, কোল্লেরু, লোনার ক্রেটার, ভিতর কণিকা, উলার হ্রদ, সুন্দরবন থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রামসর সাইট হিসেবে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি রক্ষার দায় আমাদেরই নিতে হবে। প্রাকৃতিক

বাস্তুতন্ত্র শহরকে আরো সুন্দর করে তুলতে পারে। আমরা যেন বেঁচেবর্তে থাকা লেক, জলাশয়, জলের ধারা টিকিয়ে রাখার অধিকারটুকু হারিয়ে না ফেলি। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝছি না, অথচ এখনই দাঁত উপড়ে যেতে বসেছে। চ) সর্বোপরি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে যে সমস্ত এলাকায় সেই Bio-regionগুলির ধন সম্বল নষ্ট না করে তাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব যাতে করে সেখানকার ভূগোল-জলবায়ু-পশু ও উদ্ভিদজীবন মানুষকে প্রভাবিত করে তার প্রতিবেশের (eco-system) সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় বাস করতে। অর্থাৎ এমন একটা জীবনধারার মডেল এখানে অনুসৃত হতে পারে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিকতার সম্পর্ককে স্বীকার করা হবে, কোনো ঊর্ধ্বতন-অধস্তন থাকবে না। এই সামাজিক নিসর্গবাদ তথা Social ecology-এর প্রয়োগের প্রতি আমাদের সক্রিয়ভাবে নজর দিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। Mishra Anupam, *The ponds are still Relevant,* Thannaram-Akarmaa, 2018 1st edition, p. 10

২। জয়া মিত্র, *জলের নাম ভালোবাসা,* খোয়াই ২০০১, পৃ. ২৮।

৩। জয়া মিত্র, বোতলের জল বোতলের ভূত, *আমাদের চরাচর,* সৃষ্টিসুখ, ২০১৯, পৃ. ৩৩

৪। পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, *বিপন্ন মানুষ আর মানবসৃষ্ট বন্যা,* দেশ, ১৭ অক্টোবর, ২০২১, পৃ. ১০।

সহায়ক পঞ্জি :

১। হিরণ্ময় মাইতি, *অভ্যাস বদলের কাল ও বাংলায় পরিবেশচর্চা,* বইকারিগর, ২০১৯।

২। মোহিত রায়, *বাঘা যতীন হইতে ব্রাঘ্র প্রকল্প বাঙালি মননের পরিবেশ যাত্রা,* কলকাতা - ৯১, আনন্দ প্রকাশনী, ২০১৯।

৩। শুভেন্দু গুপ্ত, *পরিবেশ নিয়ে ভাবতে শেখালেন যাঁরা,* কলকাতা-৯, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১৬।

৪। সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পরিবেশ ও মার্ক্স,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, জানুয়ারি ২০১২।

উমা

শিক্ষায় আদিবাসী সমাজ কতটা আলোকিত ঃ একটি সমীক্ষা

সঙ্গীতা মুখার্জী

শিক্ষা সুস্থ সমাজ গঠনের প্রাথমিক শর্ত। সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষগুলি, যারা সমাজ-অর্থনীতির জটিল আবর্তের অংশীদার নয়, সামগ্রিকভাবে এই জনসম্প্রদায়ের লোকেরাই মূলত আদি অধিবাসী ও ভূমিপুত্র — আমাদেরই চিরপরিচিত 'আদিবাসী সম্প্রদায়' এখনও তাদের শিক্ষা ও উন্নয়নের মূল স্রোতে ব্রাত্য করে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে আধুনিকীকরণের স্পর্শে সমাজ-অর্থনীতিতে যে উন্নয়নের জোয়ার আসে তাতে শ্রেণী সচেতনতার ব্যাপকতা প্রকটভাবে ধরা পড়ে, আর আদিবাসী সমাজও এর থেকে দূরে থাকতে পারে না। স্বভাবতই অনাড়ম্বর, জঙ্গলজীবন থেকে এই সমাজের মানুষগুলি বেরিয়ে এসে সমাজের মূল স্রোতে মিলিত হতে চায়। তাদের এই পরিবর্তিত মানসিকতার কিছুটা হলেও পরিপূর্ণ হতে পারে সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম 'শিক্ষার' আনুকূল্যে। এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরা শিক্ষার আলোয় কতটা জারিত, তা অনুধাবনের জন্যে নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম জেলার একটি ব্লকের নির্দিষ্ট দু'টি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামকে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বাক্ষরতার হারকে।

যদিও শিক্ষা প্রসঙ্গে কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কারণ বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তাকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রাচীনকালে, যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে শিক্ষা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংমিশ্রণে যে আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ, তা মানুষকে সমাজ সচেতন করতে সাহায্য করে। তাই সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি।

আধুনিক শিক্ষার পটভূমিকা — আধুনিক শব্দটি আপেক্ষিক। প্রাচীন আছে বলেই বোধহয় আধুনিক কথাটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাই এর সময়সীমা নির্ধারণ এক দুরূহ কাজ। এমন একটি সময় ছিল যখন মানুষ তার ওপর হওয়া অবিচারের ভাষা তথা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেত না। এই ভাষা স্তব্ধ করা হয়েছিল ধর্মের নামে ছড়ানো অন্ধ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ও ভাবাবেগের দ্বারা। প্রতিহত হয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ও জীবনযাত্রা। কিন্তু আধুনিকীকরণের জাদুস্পর্শে মানবসমাজ এই প্রাচীন জীর্ণতাকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেল নতুন উন্নততর জীবনের

লক্ষ্যে। মানুষ ব্রতী হল বিজ্ঞানের সাধনায়, আধুনিকতার জোয়ারে ভেসে গেল অন্ধবিশ্বাসের সংকীর্ণ ভাবনা, প্রতিষ্ঠা পেল নব্য যুক্তিবাদ। এর ফলে সমগ্র মানবসমাজে যে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হল তার ঢেউ এসে লাগল শিক্ষা, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষার বিবর্তনে দুটি প্রতিষ্ঠানের দান অসামান্য — শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এদের যৌথ প্রচেষ্টায় ও আন্তরিক সহায়তায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন সুনিশ্চিত হয়েছিল এবং ভারতীয় ভাবমানসে জন্ম নিয়েছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার অদম্য ইচ্ছা, কিন্তু তখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতি ও আদিবাসী মানুষেরা শিক্ষার ন্যূনতম ছোঁয়টুকুও পায়নি।

শিক্ষা ও আদিবাসী সমাজ — আধুনিকতার ক্রমবর্ধমান প্রসার এবং সমাজ ব্যবস্থার গতিশীলতা স্বাভাবিকভাবেই আদিবাসী সমাজকেও প্রভাবিত করেছে। আদিবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে উপজাতীয় ভাষা সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে। আদিবাসীদের এই চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে মণিপুরি, কোঙ্কনি ও নেপালি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৩ সালে বোড়ো, ডোগরি, মৈথিলি ও সাঁওতালি ভাষাকেও অষ্টম তপশিলভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৫১-৫৬ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার সচেতনভাবেই আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা ও উন্নয়ন খাতে একটি বড় অর্থ বরাদ্দ করেছে। এখন এই প্রান্তিক মানুষগুলিই তাদের সন্তানদের শিক্ষার অঙ্গনে পাঠানোর তাগিদ অনুভব করছে।

বীরভূম জেলার একটি ব্লকের সমীক্ষা — বীরভূম জেলার যে ব্লকটিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেটি হল বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক এবং এই ব্লকের অন্তর্গত দুটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামকে, এবং তার জনসংখ্যার নিরিখে স্বাক্ষরতার হারকে।

বর্তমান বীরভূমের চিত্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো। প্রায় মাঝামাঝি স্থানে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে ময়ূরাক্ষী নদী। বীরভূমের কেন্দ্রভূমি জঙ্গলের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আদিম জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের উপযোগী। বীরভূমের

বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক

গ্রামের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত	আদিবাসী জনসংখ্যা	স্বাক্ষরতার হার	প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক	মাধ্যমিক
আসদুল্লাপুর	সাত্তোর	৪৯৬	৭১.৮৯	২১.৫৭	১৪.৩৪	৩.৫৯
বিনোদপুর	রূপপুর	৩৬২	৪৪.৫৯	১৭.৮৪	১১.১৫	

সূত্র - ব্লক অফিস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	আসদুল্লাপুর	বিনোদপুর
প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩	১
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	১
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১	০

সূত্র — ব্লক অফিস

পশ্চিম সীমান্ত ছোটনাগপুর ও রাজমহল মালভূমির দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের ঢালকে অনুসরণ করেই বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, থিংলো, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বাঁশলোই প্রভৃতি নদী। বীরভূমের আদিম সাঁওতালরা এইসব নদনদীর মাধ্যমেই তথা এই পথ বেয়েই বীরভূমের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

বীরভূমের নামকরণের মধ্যেও সাঁওতালি শব্দ 'বীর' অর্থাৎ জঙ্গল শব্দটি বিদ্যমান। সাঁওতালরা এই অরণ্যকেন্দ্রিক বা বীরকেন্দ্রিক আদিবাসী। এই অঞ্চলের সন্নিকটে ছোটনাগপুর অরণ্য অঞ্চলে 'বীরহোড়' বলে এক আদিম জাতি বাস করত। কথিত আছে এই জঙ্গল ও মানুষ একত্রে 'বীরহোড়' বলে পরিচিত। বীরভূমের তৎকালীন আদিবাসী জনসম্প্রদায় সাঁওতাল, মালপাহাড়ী, বাউরি, লোহার, মাল, বাগদি, ডোম, মুচি এবং কোঁড়া। এদের মধ্যে সাঁওতালরাই এই অঞ্চলের প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী বলে বিবেচিত।

প্রাচীনকাল থেকেই বীরভূমের আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃতি এবং জীবজগতের বিভিন্ন বাস্তব চিত্র নিয়ে বেশ কিছু হেঁয়ালি মুখে মুখে প্রচলিত। সাঁওতাল

সমাজে বয়স্করা তাঁদের সারাজীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়েই এই হেঁয়ালিগুলি রচনা করে, যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকশিক্ষার অঙ্গ। এই হেঁয়ালিগুলি পল্লীসমাজে শিক্ষার বাহন হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব পায়। যা সমাজে কিশোর-কিশোরী বিশেষত ছোটদের মধ্যে নানান ধরনের বাস্তব জ্ঞান সঞ্চার করে এবং তারা নানা ভাবে উৎসাহিত হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব থাকলেও এই হেঁয়ালিগুলি তাদের লৌকিক ও সাংসারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে। যেমন কৃষিকার্য, পশুপালন, খাদ্যাভ্যাস, মধুসংগ্রহ, বীজ সংগ্রহ, কাঠ সংগ্রহ, মৎস্য শিকার প্রভৃতি।

বর্তমানে বীরভূম জেলার আদিবাসীরা যথেষ্ট সচেতন তাদের অধিকার সম্বন্ধে। শিক্ষার বাতাবরণ কিছুটা হলেও বদলে দিয়েছে তাদের জীবনশৈলী। এখানে বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম যথা, (ক) আসদুল্লাপুর এবং (খ) বিনোদপুর— এ দুটিকে সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

২০১১-এর আদমসুমারি অনুযায়ী জাতীয় গড় স্বাক্ষরতার হার ৭৪.০৪ শতাংশ, শিক্ষার হার অনুযায়ী ভারতের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান বিশতম। পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী মানুষের বাস যা ২০১১-এর আদমসুমারি অনুযায়ী রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫.৮%।

বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের অন্তর্গত আসদুল্লাপুর ও বিনোদপুর গ্রাম দুটি সমীক্ষা করার পর যে বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল, উল্লিখিত দুটি গ্রামেই আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের বসতি নেই। এই গ্রাম দুটি যথাক্রমে সান্তোর (আসুদুল্লাপুর) এবং রূপপুর (বিনোদপুর) গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট সমীক্ষায় দেখা গেছে আসদুল্লাপুর গ্রামটিতে আদিবাসীদের স্বাক্ষরতার হার ৭১.৮৯ শতাংশ এবং বিনোদপুর গ্রামের ৪৪.৫৯ শতাংশ। সুতরাং একথা অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই যে শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনে তার দ্বৈত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছে।

সমীক্ষায় আর একটি বিষয় যেটি ভাবনার জায়গা তৈরি করে সেটি হল আসদুল্লাপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে পঠন-পাঠনের সুযোগ-সুবিধাও অনেকাংশে বেশি, তাই এই অঞ্চলের আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার সুবিধা লাভ করতে পারে। সমীক্ষাকালে আসদুল্লাপুর গ্রামের এক সাধারণ ছাত্র আশুতোষ কিসকুর কথায় যে বিষয়টি উঠে আসে তা হল, সে বর্তমানে নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং সে চায় তার নিজস্ব সমাজের ঐতিহ্য ও ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। সে এমন একজন শিক্ষক হতে চায় যে তার সমাজকে সমস্ত কুসংস্কারের অন্ধ বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আশুতোষের কথায় আরও একবার প্রমাণিত হয় যে, সুশিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের দিশারী।

বিনোদপুর গ্রামটিও সম্পূর্ণভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম, তবে এখানে স্বাক্ষরতার হার আসদুল্লাপুরের থেকে অনেকটাই কম। আসদুল্লাপুর যেখানে ৭১.৮৯ শতাংশ সেখানে বিনোদপুরে স্বাক্ষরতার হার মাত্র ৪৪.৫৯ শতাংশ। এক্ষেত্রে একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, বিনোদপুর গ্রামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। আরও দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে আদিবাসী তথা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অধিকাংশই কৃষিকাজে এবং সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যেমন ১০০ দিনের কাজ প্রভৃতিতে যুক্ত। তাই শিক্ষার কদর এখনও সেই জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। যদিও বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়ের সাক্ষাৎকারে জানা যায় বিনোদপুর গ্রামটিতে স্বাক্ষরতার তথা শিক্ষার হার বর্ধনের জন্য সরকারি সহায়তায় কোনো কার্পণ্য নেই। অধিকাংশই হাঁস-মুরগি পালন, ডোকরা শিল্পে নিজেদের নিযুক্ত করায় আগ্রহী। হয়তো দারিদ্রের কালো ছায়া থেকে সাময়িক মুক্তি লাভের আশায় এই ধরনের পদক্ষেপ।

সমীক্ষায় দেখা গেছে এই অসহায়, সমাজের মূলস্রোতের অঙ্গীভূত হওয়া মানুষগুলির জীবনেও অতিমারীর গভীর প্রভাব পড়েছে। বিগত ২০২০ সাল থেকে করোনা মহামারীর আতঙ্ক যেভাবে মানুষকে আঘাত করেছে তাতে এই মানুষগুলির জীবনসংগ্রাম আরও কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আসা আদিবাসী শিশুরা হঠাৎই থমকে গেছে করোনা প্রকোপে। কোথায় পাবে তারা সভ্যসমাজের ঘরে ঘরে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের মতো স্মার্টফোন? ফলত অনলাইন শিক্ষা যে কি তা তাদের ভাবনারও অতীত। সুতরাং সদ্য বিদ্যালয়মুখী আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা আবারও আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হচ্ছে তাদের চিরাচরিত জীবনপ্রণালীকে।

হয়তো আমরা খুব তাড়াতাড়িই এই সংকট কাটিয়ে উঠব, চাই সর্বস্তরে সক্রিয় সহযোগিতা যাতে আদিবাসী সমাজের এই রূপান্তর বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে এবং এই সমাজের

অন্তর্গত মানুষগুলি যেন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রগতি ও উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে পারে। 'শিক্ষাই জাতি মেরুদণ্ড' — এই চিরন্তন সত্যের বাহক হয়ে উঠুক আজকের আদিবাসী সমাজ।

তথ্যসূত্রঃ ১। শ্রীমতি গায়ত্রী যতি, 'প্রাথমিক শিক্ষার রূপায়ন', দ্বিতীয় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪। ২। ডঃ চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড', প্রথম প্রকাশ ২০০০। ৩। গীতা বাগ, 'বীরভূমের সাঁওতালি জীবন বৈচিত্র্য', আশাদীপ পাবলিকেশন, কলকাতা-৯। ৪। ২০০১-এর সেন্সাস রিপোর্ট।

উমা

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

সাধারণ ডাকযোগে কেউ কেউ পত্রিকা পান না বলে অভিযোগ জানান। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ ডাকবিভাগের ওপর আমাদের ভরসা করতে হয়। স্পিড পোস্টে পত্রিকা পাঠানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা ও স্পিড পোস্টের খরচ বাবদ ৭০ টাকা মোট ২২০ টাকা পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে আমাদের জানালে আমরা সেইভাবে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

করোনাকালে ভারতে বাল্যবিবাহের বিস্তার ও বিপন্ন বালিকা-বেলা

মৈত্রী পণ্ডিত

রাজস্থানের কারাউলি জেলার অন্তর্গত কুদগাওন গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সায়রা বানু। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই জীবনের একটি অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে। বিগত দুই বছরে মহামারীজনিত লকডাউনের দরুন তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার এতটাই অবনতি ঘটে যে তার বাবার যৎসামান্য মাসিক আয়টুকুও বন্ধ হয়ে যায়। ছয় পুত্রসন্তান ও এক কন্যাসন্তানের পিতা তখন সিদ্ধান্ত নেন সায়রার পড়াশোনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে বিয়ে দেবার। অপ্রাপ্তবয়স্ক সায়রার অদম্য ইচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার ও ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হওয়ার। সেই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সায়রা অভিভাবকদের বোঝায় এবং বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে এলাকার সংখ্যালঘু মহিলাদের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে, যারা বাল্যবিবাহের মতো অন্যায় প্রথার থেকে কিশোরী মেয়েদের মুক্তির কাজে ব্রতী রয়েছে। এই গোষ্ঠীর কাছ থেকেই সে জানতে পারে রাজস্থান সরকার তাদের মতো দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনার জন্য কি ব্যবস্থা করেছে। এই গোষ্ঠীর সহযোগিতায় সায়রা তার বাবাকে বুঝিয়ে তার বিয়ে আপাতত স্থগিত রাখতে সক্ষম হয়েছে । সায়রার মতো অসংখ্য কিশোরী মেয়ে, যাদের বয়স এখনও ১৮ হয় নি, বিগত দুই বছরে করোনা মহামারীর এই পরোক্ষ ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়েছে আমাদের দেশে। তবে আক্ষেপের বিষয় হল, সায়রা যেভাবে এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে তার বিয়ে স্থগিত রাখতে পেরেছে, বাল্যবিবাহের শিকার অনেক বালিকাই সেটা করতে পারেনি অথবা এই কু-প্রথার মোকাবিলা করার জন্য কারোর সহযোগিতা পায়নি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই তারা আস্বাদন করতে পারেনি তাদের বালিকা-বেলা, ব্যাহত হয়েছে তাদের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বড় হয়ে ওঠা। সর্বোপরি, বাল্যবিবাহের মতো অন্যায় প্রথার মাধ্যমে তাদের অভিভাবকরা ছিনিয়ে নিচ্ছেন তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের স্বাধীনতা ও অধিকারকে। বিশিষ্ট নারীবাদী লেখিকা ও অধ্যাপিকা লায়লা কবির একজন ব্যক্তির এই ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে জীবনযাপন করার সামর্থ্য অর্জন করাকেই ক্ষমতায়ন-এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে বিবেচনা করেছেন (কবির, ১৯৯৯, পৃ.৪৩৭)। মহামারীজনিত পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র বিয়ে করার জন্য অনেক কম বয়েসি কিশোরী মেয়েকে অপহরণও করা হয়েছে। এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই করোনায় মৃত্যু হয়েছে পিতা-মাতার, এমন অনেক কিশোরীর আত্মীয়-পরিজন বা পরিচিতরা তাদের বাল্য বয়সেই বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ফলত বাল্যবিবাহ ভারতে কোনও নতুন ঘটনা না হলেও মহামারীর সময় ভারতে এই কু-প্রথার মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এই সময় সংবাদমাধ্যমগুলি দেশে ভয়ানকভাবে করোনা ভাইরাস-এর বিস্তার, চিকিৎসা পরিকাঠামোর বিপর্যস্ত অবস্থা, পরিযায়ী শ্রমিকদের চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতি, ব্যাপক সংখ্যক মানুষের রুজি-রোজগারের বন্ধ অবস্থা, মানুষের গৃহবন্দি-দশা প্রভৃতি সমস্যাগুলিকে যত

বেশি বেশি করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে, বাল্যবিবাহের ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার সমস্যাকে ততটা ব্যাপকভাবে মানুষের সামনে নিয়ে আসে নি। ফলে, বাল্যবিবাহের মতো কু-প্রথাটি করোনা ভাইরাস-এর অনুরূপ ভাইরাস রূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভয়ঙ্করভাবে কিশোরী মেয়েদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার ও স্বপ্নকে ধ্বংস করে চলেছে, যার খবর আমরা অনেকেই পাই না।

করোনাকালে কন্যা সন্তানদের মধ্যে বাল্যবিবাহের বিস্তার— ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ পপুলেশন-এর সহ সভাপতি শিরিন জেজিভয় ২০২১ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'চাইল্ড ম্যারেজেস ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক' নামক নিবন্ধে লিখেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা চাইল্ডলাইন-এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে করোনা মহামারীর প্রথম ঢেউ-এর সময় তাদের কাছে পাঁচ হাজারের বেশি অভিযোগ এসেছিল ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার বিষয়ে। করোনা শুরু হওয়ার আগে ভারতে বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু মহামারীর সময় থেকে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িষা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র-এর মতন রাজ্যগুলিতে (জেজিভয়, ২০২১)। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো-র তথ্য থেকে জানা যায়, ২০২০ সালে পুলিশ থানাগুলিতে ১১০৫১ সংখ্যক কিশোরী মেয়েকে বিয়ের জন্য অপহরণ করার অভিযোগ জমা পড়েছিল (ক্রাইম হেড-ওয়াইজ ২০২০, এনসিআরবি, পৃ.০১)। এনসিআরবি-র প্রতিবেদন অনুসারে, করোনাকালে ভারতে বাল্যবিবাহের মাত্রা আগের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে (প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০২১)। ভারতে আইনসম্মত ভাবে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ আর ছেলেদের ২১। এখানে উল্লেখযোগ্য, বাল্য-বয়সে বিবাহিতদের মধ্যে কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি। মহারাষ্ট্র-র অঙ্গন নামের একটি এনজিও-র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্য থেকে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই বেসরকারি সংস্থাটির সদস্যরা করোনা-র প্রথম ঢেউ-এর সময় বিহারের পাটনা জেলার ১৭৩ জন কিশোরী ও ২ জন কিশোর, রাজস্থান-এর ভরতপুর জেলার ২২ জন কিশোরী ও ৩ জন কিশোর, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ৪ জন কিশোরী ও ১ জন কিশোর, ঝাড়খণ্ডের পাকুর থেকে ২ জন কিশোরী ও মুম্বাই থেকে ১ জন কিশোরীর বাল্যবিবাহ আটকাতে সক্ষম হয়েছিল (কাটাকম, ২০২১)।

করোনাকালে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির কারণ — করোনা মহামারী ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। রাষ্ট্রসংঘের শিশুদের জন্য সংস্থা ইউনিসেফ-এর গণনা অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, ভারত ও নাইজেরিয়া এই পাঁচটি দেশে প্রায় ৩২৫ মিলিয়ন মহিলা বাল্যবিবাহের শিকার, এবং এর দু'গুণ মহিলা সমগ্র বিশ্বে বাল্যকালে বিবাহিত। লকডাউনের সময় পরিবারগুলির ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঙ্কট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা, সমগ্র সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বাল্যবিবাহের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। আর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কিশোরী মেয়েদের শরীর ও মনে (10 Million Additional Girls at risk of child marriage due to Covid-19, 2021)। ভারতের অবস্থা সমগ্র বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার দরুন বিদ্যালয়-ছুট কিশোরীদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারী পরিবারের আর্থিক অবস্থার উপরেও ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে, অনেক মেয়েদেরই সংসারের উপার্জন-কর্তার আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বাবা-মায়েদের পক্ষে তাদের ভরণপোষণ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে; বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্যালয়-ছুটের সংখ্যা।

মহামারীর সময় বিয়েতে খুব কম সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের সমাবেশে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে, এমনকি প্রায় গোপনে নাবালিকা মেয়ের বিয়েও দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য, স্থানীয় এনজিও অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চোখের আড়ালে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, গৃহবন্দী জীবন কিশোরী মেয়েদের মানসিকতার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। অনিশ্চয়তা ও নিঃসঙ্গতা তাদের করে তুলেছে দিশেহারা। আর্থিক অনটনে সৃষ্টি হয়েছে পারিবারিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ। এক নিদারুণ অসহায় অবস্থার শিকার হয়েছে তারা; চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।

সাম্প্রতিককালে বাল্যবিবাহ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সরকারি তৎপরতা — মহামারীর সময়ে সরকার কন্যা সন্তানদের

বাল্যবিবাহ অস্বাভাবিকভাবে বিস্তার পাওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার ২০০৬ সালে 'The Prohibition of child marriage Act' প্রণয়ন করেছিল। এই আইনের ২ নম্বর সেকশনে বলা হয়েছে যে, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েরা ও ২১ বছরের কম বয়সী ছেলেরা শিশু বলে বিবেচিত হবে এবং তাদের বিবাহ বাল্যবিবাহ বলে পরিগণিত হবে (indianemployees.com, 2007)। কিন্তু এই আইনি প্রতিবিধান সত্ত্বেও বাল্যবিবাহকে প্রতিহত করা যায়নি। টাইমস অফ ইন্ডিয়া-য় ২০২০-র ২৭ জুন একটি অনলাইন প্রতিবেদন অনুসারে, করোনার সময় ভারত সরকারের শিশুদের জন্য সংস্থা চাইল্ডলাইন অল্প-বয়সী বালক-বালিকাদের বাল্যবিবাহ ঠেকাতে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের এই সংস্থাটি অল্পবয়সী বালক-বালিকাদের বিয়ে শুধু আটকানোই থেমে থাকে নি, তাদের পরিবারের সদস্যদের বোঝানো থেকে শুরু করে সেই সব বালক-বালিকাদের হাল-হকিকতের খবরও রেখেছে তারা নিয়মিতভাবে (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২০২০)।

আবার বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজেদের মতো করে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মহামারীর সময় দ্রুত হারে বাড়তে থাকা বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য। ওড়িষ্যা সরকার একেবারে গ্রামীণ তৃণমূল স্তর থেকে অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। গ্রামপঞ্চায়েত ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় রাজ্য সরকারের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি সমগ্র রাজ্যে কোথাও বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা তার অনুসন্ধান চালানোর ব্যবস্থা করে। এই ক্ষেত্রে বয়সের প্রমাণপত্রকে পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থাও করা হয় (এক্সপ্রেস নিউজ সার্ভিস, ২০২১)। কর্ণাটক সরকারও মহামারী ও তার পরবর্তী সময় বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে এই ক্ষতিকারক প্রথার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা চাইল্ডলাইন-এর সাহায্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে (দীপিকা, ২০২১)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ২০১৩ সাল থেকেই কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছে ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের বিয়ে আটকানোর জন্য (চৌধুরী, ২০১৮, পৃ.২৫)। এই রাজ্যের জেলা শিশু সংরক্ষণ ইউনিট-এর পরিসংখ্যান অনুসারে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বাল্যবিবাহের সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি এবং করোনার সময় বাল্যবিবাহের সংখ্যা সবথেকে বেশি। বাল্যবিবাহ আটকানোর জন্য এই রাজ্যে শিশু সংরক্ষণ আধিকারিক আছেন এবং সরকারের হেল্পলাইন নম্বরের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ (সংশোধনী) বিল, ২০২১-এর বিরোধিতা — বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মেয়েদের বিবাহের বৈধ বয়স বাড়িয়ে ছেলেদের মতন ২১ বছর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৬ সালের দ্য প্রোহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট-এর সংশোধন করার সিদ্ধান্তও নেয়। ২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর সংশোধনী বিলটি পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে উত্থাপন করা হয়। সরকারের এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহের নরকযন্ত্রণা থেকে কন্যাসন্তানদের শৈশবকে রক্ষা করা, তাদের বেশি পরিমাণে বিদ্যালয়মুখী করা ও উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং কন্যাসন্তানরাও যাতে পুত্রসন্তানদের মতো আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে পিতা-মাতাদের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এককথায় ভারতের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান তথা মহিলাদের ক্ষমতায়ন করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিল লোকসভাতে পেশ করা হয়। এর জন্য ভারত সরকার হিন্দু, মুসলিম, পার্শি, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনে মহিলাদের বিবাহের যে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার সংশোধন করা (রাজলক্ষ্মী, ২০২১)। এই বিলটি নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচুর বিতর্ক ও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ব্যাপক বিতর্ক ও বিরোধিতার মূল কারণ নিহিত রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে (নায়ার, ২০২১)।

উপসংহার — উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, করোনা মহামারীর সময় সমগ্র ভারতবাসী যখন এই প্রাণঘাতী ভাইরাস-এর প্রকোপ থেকে প্রাণ বাঁচানোর অক্লান্ত লড়াই লড়ছেন, তখনি এই মহামারীর একটি কু-প্রভাব বাল্যবিবাহ কিশোরী মেয়েদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে থাবা বসিয়েছে গোপনে। এই কুপ্রথা প্রতিরোধের জন্য ভারত সরকারের যে সকল

আইনি ব্যবস্থা রয়েছে তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সম্পন্ন হয়েছে অসংখ্য বালিকার বাল্যবিবাহ। বিপন্ন হয়েছে তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাধীনতার চূড়ান্ত অধিকার। প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে কেউ কেউ এই কুপ্রথার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও, অনেকেই তা পারেনি। সুতরাং, করোনা মহামারীজনিত নিদারুণ দারিদ্রের জন্যই হোক বা করোনায় অভিভাবকদের মৃত্যুর দরুনই হোক, বাল্যবিবাহের মতন কুপ্রথার কবল থেকে এই একবিংশ শতাব্দীর বালক-বালিকাদের শৈশবকে সুরক্ষিত করার দায়বদ্ধতা কিন্তু কেবলমাত্র সরকারের নয়, বরং সমগ্র সমাজেরই। এই প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য দরকার শিক্ষার বিস্তার, কন্যা সন্তানরা যে পরিবারের বোঝা নয়, বরং পুত্র সন্তানদের মতোই পরিবারের সম্পদ, সেই চিন্তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, বাল্যবিবাহের নেতিবাচক শারীরিক ও মানসিক প্রভাবগুলির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করা। লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান এবং নারী ক্ষমতায়নকে সমাজজীবনে সুনিশ্চিত করার জন্য জাতিধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভেদাভেদ ও রক্ষণশীলতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ছেলেদের মতনই ২১ বছর করার প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়ে সরকারি প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য নারীপুরুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টার তাগিদ বর্তমানে ভীষণভাবে অনুভূত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। A. (2020, June 27). Govt intervened to stop over 5,584 child marriage during corona virus induced lockdown. *The Times of India*.

২। Chowdhury, I. S. (2018, January 20). Kanyashree Prakalpa, State Intervention to Prevent Child Marriage. *Economic and Political Weekly*, *LIII* (3), 25–28.

৩। *Crime in India Table Contents | National Crime Records Bureau*. [Police Disposal of Crime against Children (Crime Head-wise 2020), Table-4A.3].

৪। Deepika, K. C. (2021, May 12). *Activists in Karnataka for child marriages may go unnoticed during lockdown* [Press release]

৫। Express News Service. (2021, May 3). *Odisha plans to stop child marriage during COVID-19 crisis. . .* [Press-release].

৬। indianemployees.com. (2007, January 10). *Prohibition of Child Marriage Act, 2006*. https://www.Indianemployees.Com/. Retrieved April 15, 2022.

৭। Jejeebhoy, S. (2021, June 23). *Child Marriages During the Pandemic*. The India Forum. Retrieved February 8, 2022,

৮। Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, *30*, 435–464.

৯। Katakam, A. (2021, April 27). Aangan, a Mumbai-based organisation, averts 211 child marriages as the pandemic and attendant economic shocks lead to an increase in child marriages. *Frontline*.

১০। Mn, P. (2021, June 9). India's marginalised girls fighting child marriage. *Child Rights News| Al Jazeera*. Retrieved from https://www.aljazeera.com

১১। Nair, S. K. (2021, December 18). *Marriage age Bill faces Opposition resistance*

১২। Press Trust of India. (2021, September 18). *About 50% rise in child marriage cases in 2020; experts say more reporting may be a factor*

১৩। Rajalakshmi, T. K. (2021, December 29). The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill has a flawed notion of gender justice. *Frontline*.

১৪। Sah, P. (2020, September 2). *Despite the COVID-19 pandemic and the lockdown, teenage girls continue to be pushed into child marriage in Cooch Behar, West Bengal*. Gaonconnection | Your Connection with Rural India.

১৫। *10 million additional girls at risk of child marriage due to COVID-19*. (2021, March 8).

উমা

বৈবাহিক ধর্ষণ ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি

রাখী চৌধুরী

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, জোর করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিবাহ, দেবদাসী প্রথা ইত্যাদি। এই সামাজিক কুপ্রথার অনেকগুলিই সময়ের সাথে সাথে ভারত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যে এখনও কিছু কুপ্রথার অস্তিত্ব রয়ে গেছে।[১] এই ধরনের সামাজিক অভিশাপের মধ্যে একটি হল বৈবাহিক ধর্ষণ যা ভারতে প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান এবং আধুনিক ভারতেও প্রচলিত। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতীয় আইনসভার মনোভাবও বৈবাহিক ধর্ষণের প্রতি কিছুটা উদাসীন। যাই হোক, আশার কথা হল যে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার মনোভাব বৈবাহিক ধর্ষণের প্রতি এতটা উদাসীন নয় বরং ভারতীয় বিচারব্যবস্থা রাষ্ট্র থেকে বৈবাহিক ধর্ষণকে নির্মূল করার পক্ষে, যা এর বিভিন্ন যুগান্তকারী রায় থেকে স্পষ্ট।[২] বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে বৈবাহিক ধর্ষণ নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ কিন্তু ভারতে তা নয়।[৩]

ভারতে ধর্ষণের অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আইন রয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা ধর্ষণের শাস্তি প্রদান করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা ভারতের একমাত্র আইন যা বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার মহিলাদের কিছুটা সুরক্ষা প্রদান করে। এতে বলা হয়েছে যে, যদি স্বামী ১৫ বছরের কমবয়সী স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেন, সেখানে তাকে ধর্ষণের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে এই ১৫ বছর বয়সটি ১৮ বছরে পরিবর্তিত হয়েছে।[৪] তাই বর্তমানে ভারতে আইন হল যে যদি একজন স্বামী তার নাবালিকা স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম করে তবে তাকে ধর্ষণের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এই আইন বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার মহিলাদের আংশিক সুরক্ষা প্রদান করে।[৫]

'বৈবাহিক ধর্ষণ' হল এমন একটি শব্দ যার দ্বারা স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ মহিলার স্বামীর দ্বারা সংঘটিত যৌনমিলনকে বোঝায়। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর প্রতি শারীরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারেন, যার ফলে ঐ স্ত্রী ভয় পান; তিনি প্রতিরোধ করলে তার বিরুদ্ধে তার স্বামী অত্যাচার করতে পারেন।

গবেষকরা স্বামী-ধর্ষকদের সাথে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তারা ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য এবং তাদের স্ত্রী এবং পরিবারের উপর ক্ষমতা, আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করার জন্য ধর্ষণ করে থাকেন।

নারী এবং যৌনতা বিষয়ে কতগুলি ভ্রান্ত ধারণা আছে যেমন মহিলারা জোরপূর্বক যৌনতা উপভোগ করে, মহিলারা 'না' বলে যখন তারা সত্যিই 'হ্যাঁ' বোঝায় এবং আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে যৌনতা অব্যাহত রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা স্বামীদের এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করে যে তাদের তার স্ত্রীর প্রতিবাদকে উপেক্ষা করা উচিত। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি মহিলাদেরকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করে যে তারা অবশ্যই ভুল সংকেত দিয়েছেন তার স্বামীকে। মহিলারা অবাঞ্ছিত যৌন মিলনের জন্য নিজেদের দোষারোপ করেন।[৬]

বৈবাহিক ধর্ষণের প্রকারভেদ

জোরপূর্বক ধর্ষণ ঃ 'জোরপূর্বক ধর্ষণ' বলতে এমন একজন স্বামীর আচরণকে বোঝানো হয় যিনি শুধুমাত্র জোরপূর্বক যৌনতার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় হিংসা প্রয়োগ করেন। এই ধরনের ধর্ষণ সাধারণত এমন সম্পর্কগুলিতে ঘটে যেখানে হিংসা প্রধানত মৌখিক হয় অথবা এমন সম্পর্ক যেখানে শুধুমাত্র প্রাথমিকভাবে যৌন মিথষ্ক্রিয়ায় হিংসা দেখা যায়।

মারধরপূর্বক ধর্ষণ ঃ যখন মারধর এবং ধর্ষণকে একত্রিত করা হয়, তখন একে 'ব্যাটারিং রেপ' বলা হয়। শারীরিক নির্যাতনের ধারাবাহিকতা হিসেবে ধর্ষণ ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে, যৌন হিংসার সময় শারীরিক হিংসা চলতে থাকে এবং যৌনতাও সহিংস রূপ নেয়।

অবসেসিভ রেপ ঃ ধর্ষণের সবচেয়ে দুঃখজনক রূপকে 'অবসেসিভ রেপ' বলা হয়। ধর্ষক যৌনতায় আচ্ছন্ন থাকে বলে মনে হয় এবং ধর্ষণ তখন হিংসাত্মক রূপ নেয়। এই সম্পর্কগুলিতে, ধর্ষক উত্তেজিত থাকার জন্য হিংসার প্রয়োগ করে থাকেন।[৭]

বৈবাহিক ধর্ষণ সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা — মার্কসবাদীরা ব্যাখ্যা করেছেন যে প্রাথমিক বিকাশের সময় থেকে,

রাজনৈতিক এবং আইনি তত্ত্ব ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার অধিকারের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। সেই সময় থেকেই পুরুষরা সমাজে নারীর চেয়ে উচ্চতর স্থান লাভ করে এবং এইভাবে, দুই লিঙ্গের মধ্যে আইনি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য খুব স্বাভাবিকভাবে ন্যায্যতা পায়— যা একটি যৌনবাদী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি পুরুষের বংশের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রজননের উপায় এবং পণ্যগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল এবং আরও প্রয়োজন ছিল একজন পুরুষের দ্বারা একজন মহিলার কাছে নিয়ন্ত্রিত যৌন প্রবেশাধিকার। যেহেতু মালিকানা নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম রূপ হিসাবে বিবেচিত হয়, তাই নারীদের যৌন প্রকৃতির উপর ব্যক্তিগত মতামত হ্রাস করা হয়েছিল, তাদের স্বতন্ত্র পুরুষ মালিকদের মালিকানাধীন করে রাখা হয়েছিল। যে ধারণা আজ অবধি প্রচলিত রয়েছে এবং এই কারণেই স্ত্রীর দেহ এবং যৌনতার উপর স্বামীর নিরঙ্কুশ মালিকানা চ্যালেঞ্জহীনভাবে রয়ে গেছে এবং বেশিরভাগ আইনি ব্যবস্থা বিবাহের মধ্যে ধর্ষণকে স্বীকৃতি দেয় না।[৮]

বৈবাহিক ধর্ষণকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক কালের বিতর্ক— সম্প্রতি দিল্লির হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার ২টি ব্যতিক্রমকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বৈবাহিক ধর্ষণের ঘটনাকে ঘিরে একটি বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তাল এবং সি হরিশঙ্কর জে-এর ডিভিশন বেঞ্চ দণ্ডবিধির বিধানের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলার শুনানি করে উল্লেখ করেছেন যে 'বৈবাহিক ধর্ষণ একটি গুরুতর সমস্যা, যা খুব সাংঘাতিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।'

আর টি আই ফাউন্ডেশন ও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ২০১৫ সালে একটি জনস্বার্থ মামলা দাখিল করে যেটি ৩৭৫ ধারার পাশাপাশি ৩৭৬ বি ধারা দুটিকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লির হাইকোর্টে জনস্বার্থে আবেদন জানায় যে উক্ত ধারা দুটি বৈবাহিক ধর্ষণকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করে না। উক্ত জনস্বার্থ মামলায় যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আইনের এই শিথিলতা অসাংবিধানিক এবং সংবিধানের ১৪,১৫,১৯ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ-এর অধীনে বিবাহিত মহিলাদের অধিকার লঙ্ঘন করে।

অন্যদিকে মেনস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামক একটি এন জি ও মনে করে যে বিবাহিত পুরুষরা তাদের স্ত্রীর হাতে লাঞ্ছনার শিকার হয়। মেনস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট তাদের একটি সমীক্ষায় দেখেছে যে বিবাহিত নারীরা বর্তমানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারার (গার্হস্থ্য হিংসা) মিথ্যা মামলা দায়ের করে ও এই ধারাটির অপব্যবহার করে।[৯]

ভারত সরকার দিল্লির হাইকোর্টে একটি হলফনামা দাখিল করেছে যে, 'এটি পর্যাপ্তভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে বৈবাহিক ধর্ষণ স্বামীদের হয়রানির একটি সহজ হাতিয়ার হয়ে উঠবে না। হলফনামায় আরও বলা হয়েছে যে ধর্ষককে অপরাধী করা বিবাহকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের দ্বারা হয়রানির শিকার হতে পারে।'

এটা সত্য যে রক্ষণশীল এবং পিতৃতান্ত্রিক নিয়মের কারণে বৈবাহিক ধর্ষণ সহ গার্হস্থ্য হিংসার বিষয়ে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটি দেশ আছে, যেমন নেপাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা যেখানে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, কিন্তু ভারতে, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত আপত্তিকর।

সরকারের এই বিষয়ে পদক্ষেপগুলি খুবই হতাশাব্যঞ্জক, যা শুরুতেই নারীবিরোধী। সরকার ধরে নিয়েছে যে স্বামীদের দ্বারা সমস্ত যৌন ক্রিয়াকলাপকে ধর্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে এবং সমস্ত স্ত্রী সম্ভাব্য মিথ্যাবাদী, যারা মিথ্যাভাবে তাদের স্বামীদের দোষী সাব্যস্ত করতে চায়। সরকারের ধারণা যে নারীদের ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে বিবাহের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হয় তা রক্ষণশীলদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ করে।

বৈবাহিক ধর্ষণে পীড়িত নারীদের ওপর বৈবাহিক ধর্ষণের প্রভাব — মহিলারা যখন স্বামীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন, তখন তারা মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়েন। যার সাথে তাদের জীবন, সংসার এবং বাচ্চাদের ভাগ করেন তাদের দ্বারা বিবাহের বিশ্বাসের বাঁধন লঙ্ঘন করা হয়। এটি বিবাহ নামক সংস্থার লঙ্ঘন ছাড়াও, সেই স্ত্রীর বিশ্বাস বিশ্বাসঘাকতার সম্মুখীন হয়।

বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার মহিলারা অপরিচিত এবং পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার মহিলাদের চেয়ে বেশি মানসিক যন্ত্রণার শিকার। বৈবাহিক ধর্ষণের প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছেঃ অপমানিত হওয়ার লজ্জা, ভয়, অপরাধবোধ, নিজেকে দোষারোপ করা এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক আঘাত।

বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার মহিলারা বিভিন্ন কারণে বিয়ে

নামক প্রতিষ্ঠানে থাকতে বাধ্য হন। কারণ হিসেবে বলা যায় এর মধ্যে রয়েছে—আর্থিক নিরাপত্তার অভাববোধ এবং মিথ্যা আশা যে তাদের স্বামীর আচরণ ভবিষ্যতে পরিবর্তন হবে।

সবশেষে বলা যায় যে শুধু বাল্যবধূ নয়, বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানে সব স্ত্রীরই ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন। 'বৈবাহিক ধর্ষণ'-কে আইনত অনুমোদিত ধর্ষণ হিসাবে দেখা বন্ধ করা প্রয়োজন।[১০] ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি সেইজন্য এই অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো এফ আই আর করা যায় না এবং এই অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির বিধানও নেই। আরো অবাক হওয়ার বিষয় হল যে, ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায় যে সেখানে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিটি অপরাধের প্রতি বছরের পরিসংখ্যান আছে শুধুমাত্র বৈবাহিক ধর্ষণের কোনো পরিসংখ্যান নেই। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১-এ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এন সি আর বি) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায় যে ২০২০ সালে ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৭৭টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, বছরে মোট ২৮,০৪৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ২০২০ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে মোট অপরাধের মধ্যে 'স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা নিষ্ঠুরতা' ঘটনার সর্বাধিক ১,১১,৫৪৯টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল, ভারতে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ৬,৯৬৬টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছিল।[১১-১২] আমার মতে বৈবাহিক ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসার (৪৯৮-এ) অন্তর্ভুক্ত যা গার্হস্থ্য হিংসার একটি ধরণ মাত্র, অন্যদিকে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ধর্ষণকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার সবগুলি বৈশিষ্ট্যই বৈবাহিক ধর্ষণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে বৈবাহিক ধর্ষণ হল গার্হস্থ্য হিংসা ও ধর্ষণের এক সম্মিলিত রূপ। যে দেশ নিজেকে উন্নয়নশীল বলে দাবি করে, যেখানে জাতীয় আন্দোলনগুলি 'অহিংসা'কে ঘিরে সংগঠিত হয়েছে, সেখানে প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগত পরিসরে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে নারীর বিরুদ্ধে কাঠামোগত হিংসা অব্যাহত রয়েছে। শুধুমাত্র আইন করে বা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এর জন্য বন্ধু ও পরিবারের সান্ত্বনা, সহযোগিতা এবং সমর্থন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভরসার জায়গা তৈরি করে। সরকারি হোমগুলিতে এই মহিলাদের তাদের সন্তানদের নিয়ে থাকার জন্য একটি নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আইনি সহায়তা গোষ্ঠীগুলিকে মহিলাদের সহায়ক হতে হবে, যারা ভুক্তভোগী মহিলাদের স্বামীদের অপব্যবহারের সাথে মোকবিলা করার সাহস যোগাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Kumar Yadav, D., & Dalal, M. (2021). Marital Rape in India: A Critical Study. SSRN.
2. Steiner, M. (2019). Marital rape laws. (https://www.criminaldefenselawyer.com/maritalrape-laws.html).
3. Makkar, S. (2019). Marital rape: A non-criminalized crime in India. Harvard Human Rights Journal, 1 (https://harvardhrj.com/2019/01/marital-rape-a-non-criminalizedcrime-in-india).
4. Mosbergen, D. (2018). Marital Rape Is Not A Crime In India. But One High Court Judge Is Pushing For Change. (HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/india-marital-rapegujarat-high-court_n_5ac571dce4b0aacd15b82c00).
5. Patel, K. (2018). The Gap in Marital Rape Law in India: Advocating for Criminalization and Social Change. Fordham Int'l LJ, 42, 1519.
6. Rape, Abuse & Incest National Network. (2018). Marital rape. (https://www.rainn.org/pdf-files-and-other-documents/Public-Policy/Issues/Marital_Rape.pdf).
7. Finkelhor, D., & Yllö, K. (1987). License to rape: Sexual abuse of wives. The Free Press, New York.
8. Friedrich, E. (1972). The Origin of the Family, Private Property and the State. Penguin Classics; Reissue edition.
9. Dutt, S., Kataria , S., & Agrawal, A. (2020). The Slant of Marital Rape in India. Penacclaims, 8, 1–13.
10. Logananthan, S. (2019). Marital Rape. http://www.legalservicesindia.com/article/2369/Marital-Rape.html.
11. ANI (2021). 80 Murders, 77 Rape Cases Daily In 2020: What Report Reveals About Crime In India (https://www.ndtv.com/india-news/india-records-80-murders-77-rapecases-daily-in-2020-ncrb-report-2542736)
12. National Crime Records Bureau (NCRB). (2021). Crime in India, 2020.

উমা

প্রতিবেদন

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পুরনো বাংলা বই ও পত্র-পত্রিকার পাঠকপ্রিয় সংস্করণ এখনও সহজলভ্য নয়। বাংলায় ই-বুক লাইব্রেরি সেভাবে গড়ে ওঠেনি, চেষ্টা হয়তো হয়েছে কিন্তু তা সাধারণের হাতের নাগালে পৌঁছোতে পারেনি। ঠিক এই বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে বেস্টরিড পাবলিকেশনস্ অ্যান্ড ডিজিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা সম্প্রতি এগিয়ে এসেছে ই-বুক লাইব্রেরির আধারে সৃষ্টি 'কেতাব-ই' ডিজিটাল পোর্টাল বা অ্যাপ প্রকাশ করে। এই উপলক্ষে ১৭ জুলাই, ২০২২ কলকাতার রোটারি সদনে আয়োজিত একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে কেতাব-ই অ্যাপের ই-লাইব্রেরির বিশ্বজনীন পরিষেবার সূচনা করা হল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বেস্ট রিড পাবলিকেশনস-এর পক্ষে সম্পাদক তাপস দাশ তাঁদের সংস্থার উদ্দেশ্যে ও কাজের বিস্তার সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন যে, প্রয়াত সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের কয়েকটি বই, প্রবন্ধ সংকলন এবং ১৫জন নতুন লেখকের একটি গল্প সংকলন আজ এই অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে। এই গল্প সংকলনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একটি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই ১৫জন লেখকের গল্প নির্বাচিত করা হয়েছে, যা খুব সম্ভবত একটি অভিনব উদ্যোগ। উপস্থিত প্রত্যেক লেখক-লেখিকাকে আন্তরিকতার সাথে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে কেতাব-ই-র কর্ণধার পিনাকী মিত্র ই-লাইব্রেরির বাস্তব পরিকল্পনার কথা পাওয়ার পয়েণ্ট স্লাইডের সাহায্যে সহজ সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান বাংলা বই, ছোট পত্র-পত্রিকা ডিজিটাল ফর্ম্যাটে সহজ পাঠের উপযোগী করে ই-লাইব্রেরিতে রাখা হবে, যে কোনো পাঠক স্বল্প খরচে ই-লাইব্রেরির এই সুবিধা নিতে পারবেন। ওঁদের ঘোষিত নীতি বা উদ্দেশ্য যা কেতাব-ই-র পোর্টালে উল্লেখ করা হয়েছে—'কেতাব-ই বাংলা সাহিত্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের একটি প্ল্যাটফর্ম। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কাব্যের যে বিপুল সম্ভার বাংলায় রয়েছে, তাকে সারা পৃথিবীর বাংলাভাষাভাষী মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়াই এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য। কেতাব-ই ই-বই প্রকাশক ও অন্যান্য প্রকাশনার ই-বই বিক্রয়কারী, আবার দুষ্প্রাপ্য বই ও পত্রপত্রিকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেগুলির ইলেক্ট্রনিক আর্কাইভও এই অ্যাপে থাকছে, থাকছে

সম্পাদনা, ই-বুক প্রস্তুতি, প্রুফ সংশোধনের মতো পরিষেবাও। চিরকালীন ও নবীন বাংলা বই সকলের কাছে সুলভে পৌঁছনোর এই প্রবেশদ্বার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল লেখক-পাঠক-গবেষক-সম্পাদকের জন্য সব ধরনের বাংলা পাঠকের জন্য তো বটেই।'

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন রুশতী সেন, স্বপন পাণ্ডা, গৌতম সেনগুপ্ত, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং সমরেশ রায়— আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'দেবেশে রায়ের বিস্তার'। দেবেশ রায়ের অনুজ সমরেশ (ল্যাডলি) রায় বলেন যে গত বছর (২০২১) মে মাসে তাঁর দাদা কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন, আরও বলেন যে সম্ভবত দেবেশ রায়ের মৃত্যুর পর এটাই তাঁকে নিয়ে প্রথম আলোচনা সভা। প্রত্যেক বক্তাই দেবেশ রায়ের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের কথা তুলে ধরেন, যেমন আলোচনায় উঠে আসে তাঁর উপন্যাস 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'— যা উত্তরবঙ্গের জনজাতিদের জীবনযাত্রা, রাজনীতি, লোকসংস্কৃতি ও মেঠো-ভাষা-সাহিত্যের সংমিশ্রণে এক অনবদ্য সৃষ্টি।

অনুষ্ঠানে বেশ কিছু ছোট বাংলা পত্রিকার পুরনো সংস্করণের ডিজিটাল আরকাইভের সূচনা করা হয়, উল্লেখ্য *মানুষ* (*উৎস মানুষ*) পত্রিকার ১৯৮০ সালের বারোটি সংখ্যার ডিজিটাল ভার্সন কেতাব-ই-র লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে যার আনুষ্ঠানিক সূচনা সেদিনই করা হল। উৎস মানুষ পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৮০ থেকে মার্চ ২০০৩, প্রায় বাইশ বছরের সংখ্যাগুলো ধাপে ধাপে কেতাব-ই-র ইলেক্ট্রনিক আরকাইভ-এ সংরক্ষণ করা হবে তৎসহ উৎস মানুষের বইগুলিও ডিজিটাইজ করা হবে ভবিষ্যৎ পাঠকদের জন্যে। এ বিষয়ে উৎস মানুষ সোসাইটি কেতাব-ই-র সাথে চুক্তিবদ্ধ। কেতাব-ই-র এই আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই।

শ্যামল ভদ্র

উমা

প্রতিবেদন- ২

কোন পথে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ?

লিটল ম্যাগাজিন কথাটার কোনো বাংলা হয় না। লিটল কথাটার মধ্যে আছে অহংকার, 'বিগ' প্রতিষ্ঠানকে হেলায় তাচ্ছিল্য করার ঔদ্ধত্য। যা বাঙালির অনেকদিনের ঐতিহ্য। দশকের পর দশক ধরে নতুন চিন্তার, নতুন সৃষ্টির বাহন হয়ে রয়েছে বাঙালির লিটল ম্যাগ। বিপ্লবে-বিদ্রোহে-কঠোরে লিটল ম্যাগাজিন বাঙালির তারুণ্যের অপ্রতিহত প্রতীক। যার ধারাবাহিকতায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তিন তলায় বইচিত্র সভাঘরে অনীক, অন্তঃসার, ঈক্ষণ, উৎস মানুষ, একক মাত্রা, এখন বিসংবাদ, মানবমন, শিখা অগ্রবাণী, সাংস্কৃতিক সমসময় প্রমুখ ন'টি বিভিন্ন ধরনের লিটল ম্যাগাজিনকে নিয়ে একটি আলোচনা হল। বাজার-সর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিক পত্রপত্রিকার বিপরীতে বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের সাহসী সত্যনিষ্ঠার গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে যেমন আলোচনা হল, তেমনি আজকের বিশেষ পরিস্থিতিতে কী কী নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে এগোতে হবে, সে প্রশ্নও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হল।

একক মাত্রার অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, মানবমন পত্রিকার বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, এখন বি-সংবাদ পত্রিকার বাসুদেব ঘটক লিটল ম্যাগাজিন টিকে থাকার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় বরুণ ভট্টাচার্য উৎস মানুষের

অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোকপাত করেন। ওই পত্রিকার শ্যামল ভদ্র আজকের ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের আরও কাছে টানা যায়, তার উদাহরণ দিলেন। তরুণরা কি লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন? অনেকেই এ প্রশ্ন তোলেন। আবার একথাও ওঠে যে, লিটল ম্যাগাজিন কি আজকের তরুণদের মনকে ঠিকভাবে স্পর্শ করতে পারছে? সেটা করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া উচিত। ছাপা কাগজ আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থান নিয়ে, সামাজিক মাধ্যমের মন্দ ও ভালো দিক নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হল। বাংলা ভাষায় যুগের সঙ্গে যে পরিবর্তন আসছে, সে বিষয়ে সচেতন থাকার প্রসঙ্গও উঠল। দেশ জুড়ে দক্ষিণপন্থার যে আক্রমণ নেমে এসেছে তার মোকাবিলায় লিটল ম্যাগাজিনগুলির সংগঠিতভাবে একই সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা উচিত, এই মনোভাব ব্যক্ত করেন অনেকে। পাশাপাশি দুনিয়া জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ আগ্রাসন সম্বন্ধে আরও সচেতন হওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। সব মিলিয়ে বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের শক্তি, দুর্বলতা ও সম্ভাবনার কথা ভালোভাবেই উঠে এল। তবে এ নিয়ে আরও সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে আলোচনা হওয়া দরকার।

সভার মুখ্য পরিচালক ছিলেন পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক অভ্র ঘোষ, বই-চিত্রর পক্ষ থেকে তাঁর সহযোগী ছিলেন আশীষ লাহিড়ী।

— প্রতিবেদক উ মা

জলবায়ু সম্মেলন ও কোকাকোলা

২০২২ নভেম্বরে ইজিপ্টে লোহিত সাগরের তীরে সারম-এল-শেখ শহরে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলন হতে চলেছে। COP 27 (কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস) নামে পরিচিত এবারের এই সম্মেলনের স্পনসর কোকাকোলা। গ্রীন পার্টি কোকাকোলার স্পনসরশিপ নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার। তারা একে কর্পোরেট সংস্থার গ্রীনওয়াশ বলে মনে করছে। যে কোকাকোলা কোম্পানির প্লাস্টিক বোতল পরিবেশ দূষিত করছে তারাই আবার জলবায়ু সম্মেলন স্পনসর করছে, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা তা মেনে নিতে রাজি নন। তাঁরা মনে করছেন পরিবেশদূষণকারী কোকাকোলা কোম্পানি আসলে মুখোশধারী পরিবেশবান্ধব। যাদের স্পনসরশিপ সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কোকাকোলা অবশ্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে নিজেরা যে কত দায়িত্ব সচেতন তা বোঝাতে চাইছে। আসন্ন সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় আগেকার সম্মেলনে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেগুলো কতটা কার্যকরী হয়েছে তার মূল্যায়ন।

সমালোচকদের ধারণা বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা যেমন আইবিএম, মাইক্রোসফ্ট, বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনকে ব্যবহার করার আসল উদ্দেশ্য হল মার্কেটিং।

সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস। ২৫/১০/২২

খড়্গপুর আইআইটিতে অপবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে বিতর্ক

প্রযুক্তিবিদ্যার পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত আইআইটি খড়্গপুর। কয়েক বছর ধরে সেখানে শুরু হয়েছে ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ। পোশাকি নাম 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'। খবরে প্রকাশ আইআইটির উদ্যোগে মূলত আয়ুর্বেদ চর্চার ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে থাকার কথা যোগগুরু রামদেব এবং আর্ট অফ লিভিং-এর রবিশঙ্কর। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজ্ঞানচর্চায় যুক্ত একাধিক সংস্থা। 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি'র মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে অপবিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

উ মা